অগ্নিকন্যা

চিত্তরঞ্জন মাইতি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই আষাঢ়
১৮৮২ শকাব্দ

তিন টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত নীহার কুমার মুন্‌সী
শ্রীযুক্তা অরুণা মুন্‌সী
করকমলেষু

উপন্যাস রচনায় যে সকল পুস্তকের সহায়তা লাভ করেছি :

যোগেশচন্দ্র বসুর 'মেদিনীপুরের ইতিহাস', শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষের 'বাদশাহী আমল', মানুচির দেখা 'মুঘল ভারত', বোর্ণিয়ের 'ভারত ভ্রমণ'।

শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত আমাকে নানা তথ্যের সন্ধান দিয়ে অশেষ উপকৃত করেছেন।

স্বীকৃতি :

জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের প্রণয় ইতিহাস-বিদিত। এই উপন্যাসের একটি অধ্যায়ে সেই প্রণয়ের উল্লেখ আছে। কাহিনীর প্রয়োজনে এই অধ্যায়ে ঐতিহাসিক সত্যের সামান্য বিচ্যুতি ঘটেছে।

লেখক

পূর্ব ভাষণ

সমাজ-বিজ্ঞানীরা বলেন, ইতিহাসের আদিতে মানবসমাজ-মাত্রেই ছিল মাতৃতন্ত্র-শাসিত। দেশে দেশে সকল সমাজ আর সম্প্রদায়ে নারীর অগ্রাধিকার স্বীকার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। পুরুষেরা সেদিন এই নারী মহিমার প্রসারিত ছায়াতলে নিশ্চিত মনে যাপন করতো অনুগত জীবন। কল্যাণী মাতৃশক্তির সহৃদয় শাসনে তখন সকল সংসার ভরে উঠেছিল অপরূপ সৌন্দর্য-শ্রী মণ্ডিত হয়ে। কিন্তু তাতে কোন অসম্মানের কলুষ স্পর্শ করেনি পুরুষের জীবনকে। অন্নপূর্ণার দ্বারে ভিখারী শিবের মত পুরুষ তখন আশ্রয় পেতে পেরেছিল নারীর সস্নেহ হৃদয় এবং সযত্ন-সজ্জিত সংসারের মাঝখানে।

কিন্তু কালের পট পরিবর্তনে ইতিহাসেরও একদা পালাবদল ঘটলো। কে জানে কবে এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের মাঝখান থেকে নারীর প্রধান ভূমিকা ধীরে ধীরে ক্ষুন্ন হতে শুরু করেছিল। এই ক্রম-বিবর্তনের ধারায় এক সময় সমাজ-শাসনের প্রকাশ্য দরবারে পুরুষ একেবারে সর্বশক্তির অধিকার পেয়ে গেল আর এতকালের নারীত্ব-গৌরব ধীরে ধীরে কখন যে অপসৃত হয়ে গেল লোকচক্ষুর অন্তরালে, কেউ টের পেল না। কেবল ইতিহাসই সাক্ষ্য দেবে, কি করে সমগ্র নারী জাতি এক সময় পুরুষ-সৃজিত গোপন অন্তঃপুর আর অন্দরমহলের অজস্র বন্ধ দেওয়াল-দরজার বেড়াজালে বাঁধা পড়লো আর পুরুষ প্রবর্তিত শাস্ত্রবিধির অসংখ্য বাধা-নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে তাদের হাতের পুতুল হয়ে উঠলো! এতদিন নারীর সংসারে পুরুষ নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেলেও হয়তো স্বস্তি পায় নি। তাদের অবদমিত পৌরুষ তাই বুঝি আপনার নিরুদ্ধ আত্মপ্রকাশের প্রেরণায় পথ খুঁজছিল; হয়তো সেই স্বভাববশে আপনার প্রভাব বিস্তারেও মনোযোগী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এর যথাযথ কারণ নির্দেশের ভার ইতিহাসের হাতে। আমরা শুধু তার অধ্যায়ে অধ্যায়ে দেখতে পেয়েছি পুরুষের প্রচণ্ড শক্তিমত্তার উল্লাস আর একচ্ছত্র অধিকারের সদম্ভ স্বাক্ষর-লিপি।

সেই শক্তির অধিকারে দিনে দিনে পুরুষ স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে আর নারীর জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করে দিয়েছে। পৃথিবী-ব্যাপী প্রায় সকল রাষ্ট্র, দেশ, সমাজ আর সম্প্রদায়ে তাই বহুবিবাহ আর সহমরণ প্রভৃতি প্রথার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই সব প্রথা সেই নির্মম স্বৈরাচারেরই পরিচয়। সেদিন কোন দেশ বা কোন জাতিই নারীর কিছুমাত্র স্বতন্ত্র মূল্য বা স্বাধীন মর্যাদা স্বীকার করে নি। পুরুষের জীবনের অনুসঙ্গী হয়েই নারীকে সেদিন বাঁচতে হয়েছে, এমন কি মৃত্যুর বিধান পর্যন্ত নিরুপায়ে মেনে নিতে হয়েছে পুরুষ-সমাজের হাত থেকে। জীবনের অনেক অপূর্ণ আশা-বাসনার সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেহটাকেও সেদিন বিসর্জন দিতে হয়েছে সতীনারী রূপে মৃতপতির অনুগামিনী হয়ে। করুণ অথচ নিষ্ঠুর এই সহমরণ প্রথার বিচিত্র বীভৎসতা নারীর জীবনকে সেদিন বারবার বিড়ম্বিত ও আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল। এই ছিল সেদিনের সভ্যতার অঙ্গ! সুপ্রাচীন সভ্যতার গৌরবে গরীয়ান গ্রীকজাতি পর্যন্ত যে এই কুপ্রথার হাত হতে মুক্ত হতে পারে নি, দিওদোরসের বিখ্যাত গ্রন্থই তার প্রমাণ। অন্য অনেক দেশও এই প্রথামুক্ত হতে পারেনি—পারেনি চীন, পারেনি আমাদের এই আর্যভূমি ভারতবর্ষ। বরং প্রশ্রয় দিয়ে সেদিন কলুষিত করে তুলেছে নিজের অতীত ইতিহাসকে।

নানা শাস্ত্র সংহিতা আর বেদ-পুরাণের সৃষ্টিক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ। সেকালের প্রাচীন আর্যঋষিদের এই শাস্ত্রচর্চা আজও ভারতকে গৌরবান্বিত করে। কিন্তু সেই শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারেরা পর্যন্ত এই অমানুষিক সহমরণ প্রথা অনুমোদন করে নিয়মের পর নিয়ম বেঁধেছেন আর সেই সঙ্গে কল্পিত স্বর্গবাসের লোভ দেখিয়ে সমাজকে প্ররোচিত করেছেন সেই নিয়ম অনুসরণ করতে। এ বিষয়ে আমরা উদ্ধৃতি পাই :

> 'মৃতে ভর্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
> সারুন্ধতী সমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
> তিস্রঃ কোট্যর্ধ কোটী চ যানি লোমানি মানবে।
> তাবন্ত্যব্দানি তা স্বর্গে ভর্তারং যানুগচ্ছতি॥'

'যে নারী মৃত পতির সহিত একত্র হুতাশনে আরোহণ করে, সে অরুন্ধতীর সমান আচরণ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। যে রমণী ভর্তার

অনুগমন করে, সে সাড়ে তিনকোটী বৎসর এবং মানবের দেহে যত লোম আছে, তত বৎসর স্বর্গে বসতি করিয়া থাকে।'

এমনি শাস্ত্রের অজস্র অনুশাসন আর প্ররোচনায় সেই কোন্ পৌরাণিক কাল থেকেই ভারতে এই নারকীয় প্রথার সূত্রপাত। সহমরণ আর অনুমরণের নানা আড়ম্বর আয়োজনে মৃত পতির উদ্দেশে অজস্র নারীর মর্মান্তিক আত্মবিসর্জন শুরু হয়ে যায় কেবল 'সতী' নামের বিনিময়ে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে গিয়ে এই প্রথা কতদূর ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল, মধ্যযুগের ইতিহাসই তার প্রমাণ দেবে। ধর্মের নামে সেদিন এক আদিম পাশবিকতা সমাজে সংক্রামিত হতে শুরু করলো। অন্ধ কুসংস্কার আর গোঁড়ামির মূল্য দিতে শত সহস্র নারীকে সেদিন বহ্নিমান চিতার আগুনে নিঃশেষে দগ্ধ হতে হলো। তাদের অন্তিম আর্তনাদের আবেদন সেদিন মানুষের প্রাণে পৌছায় নি। সারি সারি জ্বলন্ত চিতাকুণ্ড ঘিরে ধর্মধ্বজী মানুষের পৈশাচিক উল্লাসভরা খোল করতালের তাণ্ডবে কত শত কিশোরী ও যুবতী নারীর অসহায় যন্ত্রণার আক্ষেপ হারিয়ে গিয়েছে। লেলিহান চিতার শিখায় শিখায় সারা দেশ সেদিন সচকিত, নিরুপায় প্রাণের কাতর ক্রন্দনে আকাশ বাতাস সেদিন মুখর। তবুও মনুষ্যত্বের মর্যাদায় সেদিন ঘা লাগে নি, সভ্যতার গৌরবে কোন সন্দেহ আসে নি। বরং প্রশংসা আর সাধুবাদে ভারত সেদিন নূতন সম্মানের অধিকারী হয়ে উঠেছিল। দু হাজার বছর আগে গ্রীক পণ্ডিত প্রোপারসিয়স্ ভারতের এই সহমরণ প্রথার উদ্দেশ্যে যে সশ্রদ্ধ সাধুবাদ জানিয়ে গেছেন, ইংরাজপণ্ডিত বয়শেশের ইংরাজী তর্জমায় আমরা তার পরিচয় পাই:

'Happy the laws that in those climes obtain,
Where the bright morning reddens all the main,
There whensoever the happy husband dies
And on the funeral couch extended lies,
His faithful wives around the scene appear
With pompous dress and a triumphant air
For partnership in death, ambitions strive
And dread the shameful fortune to survive!

Adorned with flowers the lovely victims stand
With smiles ascend pile and light the brand !
Grasp their dear partners with unaltered faith
And yield exulting to the fragrant death.'

ইতিহাসের সে এক কলঙ্কিত অধ্যায়। ভারতে নবযুগ সূচনার তখনো অনেক দেরি। মানবদরদী উদার-চেতা রাজা রামমোহনের আবির্ভাব তখনো ঘটে নি। ইংরাজী ও বাংলায় স্বরচিত দুখানি গ্রন্থ 'প্রবর্তক' আর 'নিবর্ত্তক'-এর মাধ্যমে তখনো তিনি এই নির্মম প্রথার উৎসাদনে মানবতার নামে এই আবেদন নিয়ে আসেন নি সমাজের দ্বারে দ্বারে : 'বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধঅঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে।······মধ্যে মধ্যে কোন কর্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয় এবং মাসমধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই।···যাহারা দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্মভয়ে এসকল ক্লেশ সহ্য করে।···এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।'

অবশেষে একদিন অবশ্য রামমোহনের এই একান্ত প্রয়াস সার্থক হয়েছিল। তাঁরই সহযোগিতায় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ঘোষণা ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর প্রচারিত হয়েছিল এই সহমরণ প্রথার অমানুষিক বর্বরতা নিবারণে।

I. The practice of Sati or of burning or burying alive the widows of Hindus is revolting to the feelings of human nature·········

II. The practice of Sati or of burning or burying alive the widows of Hindus is hereby declared illegal and punishable by criminal courts.

কিন্তু আমাদের উপন্যাসের কাহিনীকাল আরও অনেক আগে। ভারতের ইতিহাসে তখন পুরোদমে মোগল আমলের পালা। বিদেশী এই মোগল সম্রাটের দল সেদিন ভারতের বুকে রাজ্যবিস্তারে লিপ্ত। যদিও হিন্দুসমাজের এই অকল্যাণকর প্রথা তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল তবু রাজনৈতিক কারণ বশতঃ তাঁরা হিন্দুদের এই কুসংস্কার দূর করতে সাহস পাননি। হয়ত তাদের কাছে অপ্রিয়ভাজন হওয়ার আশঙ্কায়। তবে মহামতি আকবর যে একবার এই কুপ্রথা দূর করবার ক্ষীণতম চেষ্টা করেছিলেন ইতিহাসে তার নজীর মেলে। কোন এক পর্তুগীজও এই নৃশংস বিধিব্যবস্থার প্রতিকারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে জানা গেছে। কিন্তু এই সব ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় কোন প্রতিকারই সম্ভব হয় নি। সেদিন সমগ্র দেশ এক সঙ্কটাপন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক উপপ্লবের সম্মুখীন হয়ে জাতীয় সুস্থতা হারিয়েছিল। তাই বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় বিশেষ করে চরমে পৌছেছিল আমাদের মাতৃভূমি বাংলারই দিকে দিকে। পাপে, ব্যভিচারে আর অন্যায়শাসনে বাংলার গ্রামীণ সমাজ তখন পঙ্কিল। তবু মিথ্যা মর্যাদার অর্থহীন অহঙ্কারকে আঁকড়ে ধরে সেদিন সমাজ শাসকেরা সমাজ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিল। এই মুখোস-সর্বস্ব সমাজ তাই বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্য প্রথাকে সমাজের অঙ্গ হিসাবে সাদরে বরণ করেছিল। তাই দেখি, সমাজের এই মিথ্যা কুলাভিমানের মূল্য শোধ দিতে শ্মশানযাত্রী অথর্বের হাত ধরে কিশোরী কন্যা সেদিন বলির পশুর মত অনিবার্য অপমৃত্যু বরণ করতে চলেছে। এক পতির প্রজ্বলিত চিতাকুণ্ডে একাধিক ভার্যাকে নির্মম হৃদয়হীনতার সঙ্গে সমর্পণ করা হয়েছে তাদের একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য সপ্রমাণ করতে। কত অশ্রু, কত দীর্ঘশ্বাস আর কত আর্তনাদ যে সেদিন আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে গেছে, মানুষের রাক্ষসবৃত্তি তার কোন খোঁজই তখন রাখেনি। সমাজের একদিকে যখন এই নারকীয় লীলার উৎসব শুরু হয়েছে, অন্যদিকে তখন নিম্নবঙ্গে বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে আর হুগলী নদীর তীরে পর্তুগীজ জলদস্যুদের হিংস্র উৎপীড়ন ও অত্যাচার বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। গৃহস্থের সঞ্চিত ধনরত্ন সহ নিরীহ নরনারীদের পর্যন্ত তারা লুণ্ঠন করেছে হাটবাজার আর উৎসব অনুষ্ঠানের মাঝ থেকে। হাত চিরে বেতের ছিলা ঢুকিয়ে পশুর মত একত্র বন্দী করে মোটা লাভের অঙ্কে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করেছে তাদের। মোগল সম্রাটেরা অবশ্য এই অত্যাচারের প্রতিকার করার উদ্দেশ্যে সেদিন

এই সকল উপকূল অঞ্চলে 'নাওয়ার মহল' গড়ে তুলেছিলেন। 'সরবোলা' নাম দিয়ে এক শ্রেণীর লোককে নিযুক্ত করেছিলেন জনসাধারণকে বিপদ সঙ্কেত জানিয়ে পর্তুগীজদের হাত থেকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবার জন্য। কিন্তু রক্ষক হয়েও এই সরবোলারা ক্রমে ক্রমে ভক্ষক হয়ে উঠলো। তখন আর জনসাধারণের সামান্য আত্মরক্ষারও কোন উপায় রইলো না। সমকালীন সমাজ আর পর্তুগীজ দস্যুদের এই মিলিত অত্যাচারে দেশ জুড়ে যখন এমনি শোচনীয় হাহাকারের প্রতিধ্বনি বাজছে, বাংলার গণজীবনের সেই সঙ্কটাপন্ন সন্ধিলগ্নের এক আবর্ত-সঙ্কুল পটভূমিকায় আমাদের এই উপন্যাসের সূত্রপাত।

পালাচ্ছে কর্পূরমঞ্জরী। শ্রাবণের আকাশভাঙা বৃষ্টির ভেতর দিয়ে রাতের অন্ধকারের বুক চিরে সে পালাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে সে? এ মাঠের শেষে কোন্ গ্রাম? তার পরে কোন্ নদী, কোন্ জঙ্গল, কোন্ জনপদ তা সে জানে না। শুধু জানে—থামলেই মৃত্যু। পেছনে তাড়া করে আসছে এক মহা-আতঙ্ক। সারা দেহ তার সহস্রফণা নাগের মত লক্ লক্ করছে। রাতের অন্ধকারে মনে হচ্ছে সে যেন অগ্নির অসি নিয়ে তাড়া করছে কর্পূরমঞ্জরীকে।

ঘোর বর্ষাধারায় কেঁপে কেঁপে উঠছে সারা পৃথিবী। নীল লাল বিদ্যুতের জাল ছড়িয়ে বাজ পড়ছে কড়াৎ কড়াৎ। ভেক ডাকছে একটানা কর্কশ আওয়াজ তুলে, যেন মৃত্যুপুরীর ঘোষক পলাতক আসামীর কথা জানিয়ে দিচ্ছে চরাচরকে।

পিচ্ছিল পথে পিছলে পড়ে যাচ্ছে কর্পূরমঞ্জরী। পঞ্চদশী দেহটাকে মুহূর্তে টেনে তুলে আবার ছুটে চলেছে সে। এমনি অন্ধকারের আড়ালে অনন্তকাল ধরে ছুটে চলবে সে। কোথাও থামবে না। থামলেই অনিবার্য মৃত্যুর হাতে তুলে দিতে হবে তার এই দেহ, এই যৌবন,—জীবনের কত অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা!

কি মায়ায় তিল তিল করে গড়ে উঠেছে তার এই পঞ্চদশী দেহটা। চুল বাঁধতে গিয়ে প্রতিবেশিনীরা বলেছে, কেশবতী কন্যা। মেঘের প্রপাতের মত কালো চুল সারা পিঠে ছড়িয়ে চোখে মুখে সে বিদ্যুতের হাসি হেনেছে। কতদিন আর্শির দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেছে সে। পদ্মের ওপর লুব্ধ ভ্রমরের মত নিজের মুখের ওপর কালো চোখের স্থির চাহনি মেলে তাকিয়ে রয়েছে সে।

দেহটা তার থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠেছে কতদিন। জোয়ার এসেছে তার দেহের কূল ছাপিয়ে। সব সঁপে দেবার সময় যখন এল তার তখনি এগিয়ে এল মহামৃত্যু তাকে গ্রাস করবার

জন্যে। দেহ তার দাউ দাউ করে জ্বলছে। ধোঁয়ার জটাজাল উঠেছে আকাশমুখী হয়ে।

কি ভীষণ সে রূপ! স্বামীর মৃত্যুর পর কর্পূরমঞ্জরী মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল সে মূর্তি দেখে। মূর্ছা যখন ভাঙল, তখন দিনের আলো নিভে গেছে। শ্রাবণের বর্ষণ শুরু হয়েছে। কারা সব ত্রস্ত পায়ে আনাগোনা করছে। উঠে বসল ও। সমস্ত ঘটনাটা একটু একটু করে মনে পড়ল তার। শিউরে উঠল সমস্ত দেহটা। অসহায় আর্ত চোখ মেলে সে তাকিয়ে রইল। অতীত মুছে গেছে—এক জ্বলন্ত বর্তমান তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কি বীভৎস তার চেহারা।

একটি পড়শী বৃদ্ধা এগিয়ে এসে তার হাত ধরল। টেনে তুলল তাকে। কি কঠোর সে হাতের আকর্ষণ! তাকে ঘাটে যেতে হবে। কতকগুলি আনুষ্ঠানিক কৃত্য করতে হবে তাকে। অঝোর ধারায় ভিজতে ভিজতে তারা এসে দাঁড়াল ঘাটের ধারে।

একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় দাঁড়াল বৃদ্ধাটি। বৃষ্টি আর সাঁঝের আঁধারের পিছল ঘাটে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না তাব। যথাবিহিত নির্দেশ দিয়ে ঘাটে পাঠাল কর্পূরমঞ্জরীকে।

একা নেমে এল সে ঘাটের ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে।

জলের ভেতর দেহটাকে ডুবিয়ে দিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল কতক্ষণ। তারপর রাতের অন্ধকারে বৃষ্টির একটানা শব্দের ভেতর ভেসে এল আর একটা শব্দ। ঠক্-ঠক্-ঠক্।

গাছের ওপর কুড়ুল পড়ছে। ঠক্-ঠক্-ঠক্। বিরামহীন, ছেদহীন সে আওয়াজ।

মনে হল মৃত্যুপুরীর দরজায় কারা যেন ঘা দিচ্ছে। বলছে, দরজা খোল। দরজা খোল। মৃত্যুর দেবতা, তোমার ভোগের জন্যে এক পঞ্চদশী মেয়ে আমাদের ঘরে তৈরি হয়ে বসে আছে। কি বীভৎস শব্দ! কানে আঙুল দিল কর্পূরমঞ্জরী।

নাঃ, কিছুতেই সে ফিরতে পারবে না ঘরে। এই ঘাট থেকে

ফিরে গেলেই বন্দী হয়ে যেতে হবে তাকে। তারপর তার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে সঁপে দেবে তাকে মৃত্যুর দেবতার মুখে। কি ভয়ঙ্কর তার মূর্তি! তার চেয়ে এই পুকুরের শীতল জলে যদি ডুব দিয়ে তলিয়ে যায় সে, তাহলে সে মৃত্যু হবে অনেক সহজ, অনেক নির্ভয়।

ডুব দিল কর্পূরমঞ্জরী। কত নীচে পুকুরের তলায় হাঁসের মত জল কেটে কেটে ডুবে যেতে লাগল কর্পূরমঞ্জরী। কিন্তু একি, কে তাকে আবার ঠেলে তুলে দিলে জলের ওপরে। এই শীতল মৃত্যুর রাজ্য থেকে কে তাকে ফিরিয়ে দিলে জীবনের রাজ্যে। সে বাঁচবে। যতক্ষণ প্রাণ আছে দেহে সে মৃত্যুকে দুহাত দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবে।

রাতের অন্ধকারে জল কেটে সাঁতার দিয়ে পুকুরের ওপারে গিয়ে উঠল কর্পূরমঞ্জরী। তারপর মাঠের মাঝ দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল সে। চারিদিকে নিরন্ধ্র অন্ধকার কর্পূরমঞ্জরীকে ঢেকে রাখল সহস্র চক্ষুর আড়ালে। পালাতে লাগল কর্পূরমঞ্জরী। মৃত্যুর হাত থেকে জীবনকে বাঁচাতে হবে। যেমন করেই হোক্।

কতক্ষণ চলেছিল হুঁশ ছিল না তার। কখনো দৌড়েছে। কখনো ক্লান্ত দেহটাকে টেনে টেনে নিয়ে গেছে। বৃষ্টিধারা বন্ধ হয়ে গেছে কতক্ষণ। আকাশে পুঞ্জ মেঘের ফাঁকে শেষ রাতের একটা অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার ম্লান আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

কর্পূরমঞ্জরী এতক্ষণে অনুভব করল একটা বালুস্তূপের ওপর দিয়ে সে হেঁটে চলেছে।

নরম বালুর ওপর বৃষ্টির জল পড়ে তা বসে গেছে। তার ওপর দিয়ে সহজভাবেই সে চলতে পারছে তাই। আশে পাশে কোথাও কোথাও ছোট বড় গাছের জটলা। তার মাঝে উঁচু নীচু বালুর বিস্তার। জনহীন প্রান্তরের মাঝে এসে কর্পূরমঞ্জরী অনেকখানি আশ্বস্ত হল। যে উত্তেজনা তাকে এতখানি পথ চালিয়ে নিয়ে এল তা এখন স্তিমিত হয়ে এসেছে। কর্পূরমঞ্জরী ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

অদূরে গাছের আড়ালে একটা আস্তানার মত মনে হচ্ছিল। সে সেইদিকেই এগিয়ে চলল। বালুর পথ ভেঙে একটা টিপির ওপর উঠেই সে দেখতে পেল একটা ভাঙা মসজিদ। রাতটুকুর মত এখানে আশ্রয় নিতে হবে। কর্পূরমঞ্জরী সেই মসজিদের চত্বরে উঠে একটি থামের আড়ালে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল। তারপর ঘুম নামল কর্পূরমঞ্জরীর চোখে। সমস্ত চিন্তা, সমস্ত চেষ্টার শেষ হল। অঘোরে ঘুমুতে লাগল সে। কতক্ষণ এমনি করে ঘুমিয়ে রইল। তারপর আচমকা ঘুম ভাঙল তার আশ্চর্য মধুর একটা ডাকে। চোখ মেলে সে উঠে বসল।

একটি স্তম্ভের ওপরে দাঁড়িয়ে একটি মানুষ সুর করে আকাশের পানে দু'হাত তুলে আজান ডাকছে।

প্রথমে কর্পূরমঞ্জরী ভয় পেল। এই ফাঁকে পালাবে কিনা ভেবে নিল, কিন্তু কে যেন তাকে আটকে দিলে। সে চলবে ভেবেও চলতে পারল না। ঈশ্বরের নাম নিচ্ছে যে তার কাছ থেকে পালিয়ে সে যাবে কোথায়।

অবাক চোখ মেলে কর্পূরমঞ্জরী তাকিয়ে রইল ওপরের দিকে। লোকটি একটি আলখাল্লা পরে দুহাত তুলে আল্লার কাছে তার প্রাণের আবেদন জানাচ্ছে।

কর্পূরমঞ্জরী সেই মসজিদের মাটিতেই মাথা ঠেকিয়ে তার আকুল হৃদয়ের প্রণাম জানাল।

দুই

আগ্রার প্রাসাদে মীনাবাজারের উৎসব বসেছে। সারারাত ধরে আমীর ওমরাহদের সুন্দরী পত্নী আর কন্যারা মেলার পণ্য সম্ভার সাজিয়েছেন।

বিচিত্র সূচীকর্মের নিদর্শন রাখা হয়েছে। রেশমী কাপড়ের

ওপর জরীর নকশা ফুলপাতা তোলা, কারুকর্ম-খচিত শিরোপা, মাঝে জ্বলছে পোখরাজ মণি। কোথাও রয়েছে কোমরবন্ধ—সূক্ষ্ম সোনালী ফুলের ঝালর ঝুলছে তাতে। মসলিন রয়েছে—একখানা শাড়িকে একটি ছোট্ট সুন্দর আংটির ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। শাড়ির মাঝে আংটি, তার দুদিকে প্রজাপতির পাখার মত ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শাড়িখানা। বিচিত্র আতরদান, গোলাপ পাশ, গজদন্তের বাহারী সূর্মাদানী, আরও কতশত সামগ্রী।

ভোরের সানাই বেজে উঠল নাকাড়াখানায়। রাতের আলস্য কাটাবার জন্য ওমরাহ পত্নীরা চোখেমুখে গোলাপজলের ঝাপটা দিয়ে নিলেন। এবার পরস্পরে আড়চোখে দেখে নিলেন একে অন্যের দোকান। নিজের দোকানটির দিকে যাতে বাদশাহের নজর পড়ে সেজন্যে প্রবীণা ওমরাহপত্নীরা সঙ্গে এনেছেন তাঁদের সুন্দরী কন্যাদের। তারা আকর্ষণ করবে বাদশাদের দৃষ্টি। বাদশাহের কাছ থেকে পাবে সোনার মোহর পুরস্কার।

একটি কিশোরী কন্যা আজ ঘুরে ফিরছে সাজান দোকান-গুলিতে। একটি বিচিত্র প্রজাপতির মত সে উড়ে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। মালা থেকে খসে পড়া মুক্তোর দানার মত সে হাসি ছড়িয়ে চলেছে।

প্রতিটি দোকানে তার অবাধ গতায়াত। সবাই জানে—এই সুন্দরীদের মেলায় সে শ্রেষ্ঠতমা। বয়সে কিশোরী, কিন্তু রূপে চিত্তহারিণী।

বাদশাহের পরিদর্শনের সময়ে সে যে দোকানে থাকবে সেই দোকানই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ বিপণি। তাই সবাই তাকে খাতির করছে। সবাই তাকে মধুর কটাক্ষ হেনে নিজের নিজের দোকানের কাছে আসতে বলছে।

কিশোরীর পরনে জাফ্রান রঙের পায়জামা, জরীর ফুলতোলা অপরূপ কাঁচুলি, পায়ে বাঁকানো লাল মখমলী চটি। তার

ওপরে বিচিত্র জরীর ফুল। মাথায় একটি মেরুণ রঙের টুপি, তার থেকে ঝুলছে সোনার চুম্‌কী আর ঝালর। তার পাশে আলতো-ভাবে আটকানো একটি বসোরাই গোলাপ। মসৃণ গ্রীবা বেষ্টন করে একটি সফেদ রঙের ওড়না বুকের হু'দিকে স্খলিত হয়ে পড়েছে। কিশোরীর সুর্মাটানা চোখে কেমন এক রহস্যময়তা।

সম্রাট আকবর এলেন মীনাবাজারে। আজ খুশরোজের দিনে তিনি জিনিসপত্র কিনবেন ওমরাহ্-মনসবদার-পত্নীদের কাছ থেকে।

এবার চঞ্চল হয়ে উঠল সবাই। বাদশাহের সঙ্গে হারেমের মহিলারা এসেছেন। তাঁরাও বাদশাহের সঙ্গে শখের কেনাকাটা করতে বেরিয়েছেন আজ। দরদস্তুর শুরু হল। দস্তুরমত চলল অভিনয়। পণ্যের দর বেশী হলে বাদশা শিউরে উঠছেন। এত দামে কেনার সামর্থ্য যে তাঁর নেই তা তিনি চড়াগলায় প্রচার করছেন। ওমরাহ্-পত্নীরা নিজ নিজ সামগ্রীকে সবচেয়ে সেরা বলে প্রচার করে চলেছেন। শেষে অনেককিছুই কেনাকাটা হল।

বাদশাহ্ রূপসীদের মোহর বকশিশ দিলেন। কিশোরী মেয়েটিও সে বকশিশ পেল। সম্রাট তার সহবৎ ও সম্ভ্রমবোধ দেখে খুব প্রীত হলেন।

বাদশাহ ও হারেমবাসিনীরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মেলা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু আবার তাতে দ্বিগুণ উদ্দীপনার সঞ্চার হল। যুবরাজ জাহাঙ্গীর আসছেন এ খবর জেনানা মহলে ছড়িয়ে পড়ল। জাহাঙ্গীর অত্যন্ত মেজাজী আর আমুদে। ওমরাহ্-পত্নীরা নিজের নিজের কন্যাকে এবার দোকানের একেবারে সামনে এনে দাঁড় করালেন। যদি যুবরাজের দৃষ্টি একবার কেউ আকর্ষণ করতে পারে তাহলে শুধু যে তার পিতামাতার বরাত ফিরবে তা নয়, এমন কি সে কন্যা কালে বেগমও হতে পারবে। অবশ্য সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও আশার শক্তি অসীম।

জাহাঙ্গীর এলেন। সুদর্শন পুরুষ, যুবরাজোচিত সাজে সজ্জিত।

সঙ্গে একদল ইয়ার দোস্ত, প্রধানতঃ ওমরাহ-তনয়েরা। যুবরাজ কোন কোন জিনিস কিনলেন, আর সেজন্যে বাদশাহের চেয়েও অনেক বেশী মূল্য দিলেন। ওমরাহ-কন্যাদের খুশী করার জন্য তিনি দু' একটা রসিকতাও করলেন। সেই রসিকতাকে অতি আশাবাদী মেয়েরা ভাগ্যোদয়ের সূচনা বলেও মনে করল।

দক্ষিণপ্রান্ত পরিভ্রমণ শেষ করে শাহজাদা এসে দাঁড়ালেন পূর্ব-প্রান্তের একটি দোকানে। চম্‌কে উঠলেন যুবরাজ জাহাঙ্গীর। শুকতারার মত উজ্জ্বল একটি নক্ষত্র তাঁর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে, সুর্মা-টানা চোখে অপার বিস্ময় থমকে আছে। কিশোরী মেয়েটি একটি জহরতের দোকানে দাঁড়িয়েছিল। শাহাজাদা জহরতের দিকে একবার তাকালেন। দক্ষ জহুরী তিনি, শ্রেষ্ঠ জহরতটি চিনে নিতে তাঁর মুহূর্তকাল দেরি হল না। এই কন্যাটিকেই ত তিনি এতকাল খুঁজে ফিরছেন। অশ্বারোহণে পথ দিয়ে যাবার কালে কতদিন তিনি কোন এক ওমরাহের গৃহ বাতায়নে ঝর্ণাধারার মত উচ্ছল হাসির শব্দ শুনে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরেছেন। কিন্তু তাঁর চোখ বাতায়নে স্থির হতে না হতেই মেয়েটি বিদ্যুৎ দীপ্তির মত ক্ষণিক উজ্জ্বল হয়ে সরে গেছে।

সেই মুহূর্তে গভীর অন্ধকারে ডুবে গেছে শাহজাদার মন। আবার কখনো তিনি মেয়েটিকে দেখেছেন প্রৌঢ় একটি পার্সীর হাত ধরে যমুনার তীরে বেড়াতে। কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই তারা নৌকোয় উঠে যমুনা পার হয়ে গেছে। এ পারে শুধু ভাসিয়ে দিয়ে গেছে দু' এক কলি গানের সুর। শাহজাদার সারা প্রাণ গুনগুনিয়ে উঠেছে।

কেবল একটি দিন শাহজাদা দেখেছেন কন্যাটিকে অনেকখানি নিকট থেকে।

সেদিন মিঞা তানসেন তাঁর নতুন সৃষ্ট টোড়ী রাগে গান ধরেছিলেন।

ভোর থেকে বাদশাহের দরবারে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। তখ্‌তে বসে আছেন সম্রাট। প্রথামত নীচে একটি ঘেরাও চত্বরে দাঁড়িয়ে আছেন আমীর-ওমরাহের দল। তারপর অগণিত জনতা দরবার ঘরে সামিয়ানার তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। মসলিপত্তনের কাপড় দিয়ে সাজানো নীল সামিয়ানার বুকে কয়েক ঝাঁক উড়ন্ত পাখি চিত্রিত। তান ধরেছেন মিঞাসাহেব। ভোরের বাতাস বয়ে আসছে যমুনার জল ছুঁয়ে। সুরের ঢেউ আর শীতল বাতাসের ঢেউ এক হয়ে গেছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে অনুভূতির তন্ত্রীগুলো। মনে হচ্ছে যেন নীল সামিয়ানাখানা ভোরের আকাশ হয়ে গেছে, আর আকাশ ছুঁয়ে উড়ে চলেছে এক ঝাঁক ভোরের সাদা পাখী। মোহমুগ্ধের মত জনতা দেখছে এই দৃশ্য—সুরের ইন্দ্রজাল! শাহজাদা জাহাঙ্গীর দেখছেন অন্য দৃশ্য।

মিঞা তানসেনের একদিকে বসে আছেন সঙ্গতদার দবীর খাঁ আর অন্যদিকে রয়েছেন গীতকার পয়গল খাঁ। কবি পয়গল খাঁর পাশে বসে একটি বীণায় সুর ধরে রেখেছে সেই কন্যা। জাহাঙ্গীর দেখছেন তাকে। সমস্ত দেহটা তার শ্বেতবসনে ঢাকা।

সুরের আসনে যেন ঊষা এসে বসেছেন। শাহজাদা তাকিয়ে-ছিলেন সেই কন্যার দিকে। এক সময় গান ভাঙল, সভা ভাঙল। সকলে চলে গেল। শাহজাদার চোখে কিন্তু জেগে রইল সেই ছবি।

আজ সেই ভোরের শুকতারাকে শাহজাদা মুখোমুখি দেখলেন। আর দেখেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

মেয়েটি শাহজাদাকে দেখে যথারীতি অভিবাদন করেছিল, এখন নীরবে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল। শাহজাদার অভিরুচি হলে জিনিস কিনবেন—তারই প্রতীক্ষা।

শাহজাদা শ্রেষ্ঠ জহরতটি কিনতে চান তাই নিজের অঙ্গুলি থেকে একটি অতি মূল্যবান হীরের আংটি খুলে নিয়ে বললেন, এই

হীরককর চেয়ে মূল্যবান যদি কোন জহরত তোমার থাকে তাহলে তাই দাও।

বলার সঙ্গে সঙ্গে শাহজাদা আংটিটি কিশোরীর হাতে দিলেন।

আংটির হীরে উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছিল। অন্য জহরতগুলি তার কাছে অতি নিষ্প্রভ বলে মনে হল। মেয়েটি শাহজাদার আংটি ফিরিয়ে দিতে গিয়ে বলল, এই সামান্য বিক্রেতাকে লজ্জা দেবেন না শাহজাদা।

আংটি ফিরিয়ে নেবার জন্যে হাত বাড়ালেন না জাহাঙ্গীর। শুধু বললেন, কিনতেই যখন এসেছি তখন মূল্য ফিরিয়ে নেব না। এই আংটিই হল আমার অগ্রিম মূল্য। যেদিন এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ জহরত পাওয়া যাবে সেদিন বাকী মূল্য দিয়ে তা কিনে নেব।

কিশোরী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল শাহজাদার মুখের দিকে।

জাহাঙ্গীর বললেন, আমি যে অগ্রিম মূল্য দিলাম তার পরিবর্তে তোমার স্বীকৃতি-স্বরূপ আমার কাছে কিছু রাখতে হবে।

বিব্রত হল কিশোরী। বললে, আমার কাছে এমন কি মূল্য-বান বস্তু আছে যা শাহজাদার হাতে তুলে দিতে পারি!

সহাস্যে জাহাঙ্গীর বললেন, আপাততঃ তোমার ঐ বসোরা গোলাপটি যদি আমাকে দাও তাহলে অন্য কিছু চাইবার দরকার হবে না।

কম্পিত হাতে কিশোরী গোলাপটি তুলে দিলে শাহজাদার হাতে। জাহাঙ্গীর অমনি বলে উঠলেন, এই শ্রেষ্ঠ গোলাপের খসবু একদিন সারা হিন্দুস্থানকে আমোদিত করবে।

চলে গেলেন শাহজাদা প্রাসাদের ভেতরে। মীনাবাজারের উৎসব ভেঙে গেল। আর ভাঙল একটি কিশোরীর মন।

এ আনন্দ কি বেদনা তা বুঝতে পারল না দরিদ্র মির্জা ঘিয়াসের কন্যা মেহেরউন্নিসা। তখন তার জন্ম হয়নি, মা বাবা থাকতেন

পারস্যে। অতি অসচ্ছল ছিল তাঁদের অবস্থা। মা করতেন এক বিত্তবানের গোলাপবাগে মালিনীর কাজ। পারস্যের গোলাপ বিখ্যাত, কিন্তু তার মায়ের হাতেও যেন যাদু ছিল! আশ্চর্য বড় বড় গোলাপ ফুটত মায়ের সযত্ন তত্ত্বাবধানে।

একদিন তাদের এই সামান্য কাজটিও চলে গেল। মালিকের সঙ্গে কি এক কলহে মা অপমানিতা বোধ করে কাজ ছেড়ে দিলেন। বাবা বললেন, এ দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে পারস্যে আর থাকব না।

হিন্দুস্থানের মোগল বাদশাদের দীপ্তি তখন ছড়িয়ে পড়েছিল পারস্যের ঘরে ঘরে। দরিদ্র মির্জা ঘিয়াস ভাগ্য ফেরাবার আশায় সপরিবারে চলে এলেন হিন্দুস্থানে। আকবর বাদশাহের অনুগ্রহে রাজসরকারে পেলেন সামান্য কর্মচারীর কাজ। মির্জা সাহেব দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু নিঃসম্বল ছিলেন না। সঙ্গে তাঁর যে কন্যা ছিল তার রূপের আগুন সত্যই একদিন ছড়িয়ে পড়ল সারা হিন্দুস্থানে। সেই আগুনের প্রথম পতঙ্গই হলেন শাহজাদা জাহাঙ্গীর স্বয়ং।

এরপর পয়গল খাঁ আর দবীর খাঁর গৃহে চলল মেহেরউন্নিসা আর শাহজাদা জাহাঙ্গীরের গোপন সাক্ষাৎকার। যমুনার তীর হল দুই তরুণ তরুণীর নৈশভ্রমণের লীলাভূমি। ফতেপুর সিক্রির সুরম্য দুর্গ তখন মনোরম বিস্ময়। শাহজাদা মেহেরউন্নিসাকে নিয়ে মধ্যে মধ্যে সেই অসমাপ্ত প্রাসাদের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ফতেপুর সিক্রির জনহীন প্রাসাদ সহসা মেহেরউন্নিসার মঞ্জীর ঝঙ্কারে মুখর হয়ে উঠত। কখনো উভয়ের কলহাস্যে পাষাণের বুকে কেঁপে কেঁপে উঠত প্রাণের তরঙ্গ।

শাহজাদা বলতেন, সেদিন মীনাবাজারে যে শ্রেষ্ঠ জহরতটি খুঁজেছিলাম, তা আজ আর একেবারে দুর্লভ বলে মনে হচ্ছে না। মেহেরউন্নিসা হেসে বলত, সেজন্য কি মূল্য দেবেন শাহজাদা?

আমার দিল্, আমার জান—পুষ্পিত লতার মত কোমল হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে উত্তর দিত শাহজাদা।

মেহেরউন্নিসা সেই মুহূর্তে নির্বাক হয়ে যেত। তার মনে হয়তো জাগত জিজ্ঞাসা। এ আনন্দের শেষ পরিণতি কোথায়। সামান্য দরিদ্র কর্মচারীর কন্যা সে। বাদশাহ আকবর তাকে কি করেই বা সুনজরে দেখবেন ?

তাকে সহসা নীরব হয়ে যেতে দেখে শাহজাদা কত প্রশ্ন করতেন। কিন্তু না। মেহেরউন্নিসা তার কোন জবাবই দেয়নি। তার দুশ্চিন্তাকে সে এই আনন্দের মুহূর্তগুলোতে দু'হাত দিয়ে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করত।

কিন্তু মেহেরউন্নিসার সে আশঙ্কা একদিন সত্য হল। শাহ-জাদার গোপন প্রণয়ের খবর বাদশাহের কানে গিয়ে পৌঁছল। তৈমুর বংশধর করবে সামান্য পরিচয়হীন কর্মচারীর কন্যার পাণিগ্রহণ ? অসম্ভব। তাছাড়া বাদশাহের চিন্তায় তখন সারা হিন্দুস্থান। রাজপুতদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করে প্রবল সংক্ষুব্ধ শক্তিকে তিনি সংযত করতে চেষ্টা করছেন। এ অবস্থায় যুবরাজের সঙ্গে কোন রাজপুত কন্যার বিবাহ দিয়ে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করতে চান। সামান্য কর্মচারীর কন্যাকে ভালবেসে সাদি করবে শাহজাদা, প্রণয়ের ততখানি মর্যাদা দেবার কোন প্রয়োজন অনুভব করলেন না বাদশাহ আকবর।

কিন্তু বাদশাহ মুখে কোন কথা বলে প্রতিবাদ জানালেন না। তিনি মির্জা ঘিয়াসকে একান্তে ডেকে বললেন, তোমার মেয়েটির ব্যবহারে আমি বিশেষ প্রীত হয়েছি। আমার ইচ্ছা আমার সরকারের মনসবদার শের আফগানের সঙ্গে তার সাদি হয়। আমি আফগানের সততা লক্ষ্য করেছি অনেককাল। এ সাদি হলে আমি বিশেষ খুশীই হব।

মির্জা সাহেব বাদশাহকে তাঁর করুণার জন্য বার বার কুর্ণিশ

করলেন। আনন্দে, উত্তেজনায় প্রায় নির্বাক হয়েই তিনি বাড়ীতে ফিরে এলেন।

ইতিমধ্যে বাদশাহ আগ্রা থেকে শাহজাদা জাহাঙ্গীরকে কর্মান্তরে পাঠিয়ে দিয়ে মির্জা ঘিয়াসের কাছেই লোকমারফত রটনা করলেন, শাহজাদা নিমন্ত্রিত হয়ে রাজপুতনায় (মানসিংহের আলয়ে) গেছেন। সেখানে সম্ভবতঃ তিনি তাঁর ভাবী বেগমকে নির্বাচন করবেন।

কথাটা মির্জা ঘিয়াসের অন্তঃপুরে ছড়িয়ে পড়তে বেশী সময় লাগল না। শাহজাদা যাত্রার আগে যাতে মেহেরউন্নিসার সঙ্গে দেখা না করেই আগ্রা ত্যাগ করেন সে ব্যবস্থাও বাদশাহ করলেন। কালবিলম্ব না করে জরুরী কার্যে দ্রুতগামী অশ্বারোহণে যেতে হল রাজপুতনায়। সঙ্গে গেলেন বিচক্ষণ কয়েকজন ওমরাহ—সৈন্যসহ।

মেহেরউন্নিসা শাহজাদার দেখা পেলে না। পরে যখন শুনল জাহাঙ্গীর রাজপুতনা গেছেন তাঁর ভাবী রাজপুতানী বেগম নির্বাচন করতে তখন মনে মনে তীব্র এক দংশন অনুভব করল। প্রথমে তার মনে হল যমুনার জলে ডুবে জীবনের লীলা শেষ করবে। কিন্তু যে যমুনায় চাঁদিনী রাতে কত দিন তারা বজরায় বিহার করেছে সেই স্মৃতির জ্বালাভরা যমুনায় আজ আর মেহেরউন্নিসা কোন মতেই যেতে পারল না।

আবার মনে হল, ফতেপুর সিক্রির দূর্গ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলে এ জীবনের জ্বালা জুড়োবে। কিন্তু না! সেখানে স্মৃতির দংশন ক্ষতবিক্ষত করে দেবে। সেই অসমাপ্ত দূর্গের অভ্যন্তরে হয়ত আজও ভাসছে তার মঞ্জীরের মুখর ধ্বনি। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে শাহজাদার মুগ্ধ চোখের চাহনি। স্মৃতির তীব্র দংশনের পর এক সময় ক্লান্ত হয়ে এল মেহেরউন্নিসার সমস্ত মন।

ঠিক সেই সময় মির্জা ঘিয়াস ও শের আফগানের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন।

ক্লান্ত অবসন্ন মনে মেহেরউন্নিসা কোন প্রতিবাদ করতে পারল

না। বরং নিজেকে কারু কাছে সঁপে দিয়ে তার ব্যক্তিগত ইচ্ছার শেষ টানতে চাইল।

শের আফগানের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল মেহেরউন্নিসার। আকবর বাদশাহ এ বিবাহ যাতে উপযুক্ত ভাবে সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করে দিলেন। মেহেরউন্নিসাকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু উপহার দিতে চাইলেন বাদশাহ।

মেহেরউন্নিসা মনে মনে বলল, অশেষ অনুগ্রহ বাদশাহের। মুখে বলল, জাঁহাপনা, আমাদের যদি আগ্রার বাইরে সত্বর যাবার সুযোগ করে দেন তাহলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

আগ্রা তখন মেহেরউন্নিসার কাছে শূন্য মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

বাদশাহ সানন্দে নবদম্পতিকে বাংলাদেশের বর্ধমান সরকারে পাঠাবার সমূহ ব্যবস্থা করে দিলেন।

মেহেরউন্নিসার ইচ্ছানুসারে গীতশিল্পী পয়গল খাঁ আর নৃত্যশিল্পী দবীর খাঁকেও বাদশাহ যথোপযুক্ত বৃত্তি দিয়ে তার সঙ্গে পাঠালেন। জাহাঙ্গীরের চোখের সামনে থেকে এই বিদ্যুৎপর্ণা রমণীকে সরিয়ে দিয়ে বাদশাহ মনে মনে বিশেষ নিশ্চিন্ততা অনুভব করলেন।

আগ্রা ত্যাগের পূর্বে মেহেরউন্নিসা একদিন গেল ফতেপুর সিক্রির দূর্গে। চাঁদের আলোয় পাঞ্চমহল অদ্ভুত রহস্যময় মনে হতে লাগল। বড় বড় স্তম্ভগুলি মনে হল প্রতীক্ষা করে আছে, এখুনি নৃত্যের নূপুর বেজে উঠবে। অসমাপ্ত একটি অলিন্দে গিয়ে বসল মেহেরউন্নিসা; দু'ছত্র গীত ভেসে এল তার কানে। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল সে। কতদিন আগেকার শোনা এই গীত আজ তার স্মৃতির পথ বেয়ে কি বেদনার মূর্তি নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

সেদিনও এমনি চাঁদিনী রাত ছিল। তবে কুয়াশার একটা পাতলা চাদর সমস্ত পথ-প্রান্তরে বিছান ছিল জাহাঙ্গীর আগেই এসে অপেক্ষা করছিলেন ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদে। কতক্ষণ এমনি

বসে রইলেন, কিন্তু প্রেমিকার সাক্ষাৎ পেলেন না। দীর্ঘ রাত্রি তাঁর অসহ্য প্রতীক্ষার যন্ত্রণায় কাটল। শেষ রাতে যখন চাঁদ ঢলে পড়ল পশ্চিম আকাশে তখন তিনি অভিমানে ভেঙে পড়লেন। একটি বিরহ সংগীত রচনা করে আপনমনে গাইতে লাগলেন।

বুল্‌বুল্ নী-অম্ কি ন'অরহ্ কুনম্ দর্দ্-ই-সর্।
পর্‌বান্-অম্ কি সূজ. ম্ ব্র দম্ বর্‌নী-আব্রম্।

আমি বুলবুল নই যে আমার কান্না দিয়ে অন্যের ব্যথা জাগাব। আমি পতঙ্গের মত পুড়ে মরব তবু কোন অনুযোগ জানাতে যাব না কাউকেও।

আপন মনে শাহজাদা গান গেয়ে চললেন। তাঁর হৃদয়ের বেদনা গানের সুরে সুরে চন্দ্রালোকিত প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। হঠাৎ এক অবগুণ্ঠনবতী রমণী দুর্গমুখে আসতে গিয়ে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন। প্রচ্ছন্ন কুয়াশার মায়াময়তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রহস্যময়ী রমণী সেই গীতমদিরা পান করতে লাগল।

শাহজাদার সেদিনের সেই বিরহ সংগীত আজ সারা ফতেপুর সিক্রির নির্জন প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলল।

এক সময় কান্নায় ভেঙে পড়ল মেহেরউন্নিসা। তার বিরহে যে একদিন অগ্নিতে পতঙ্গের মত পোড়াতে চেয়েছিল নিজেকে সে আজ কোথায় উড়ে গেছে। শুধু রেখে গেছে এক ঝলক আগুনের দাহ।

উঠে দাঁড়াল মেহেরউন্নিসা। বুকের নিভৃতি থেকে সে বের করল একটি পত্র। তারপর লৌহ শলাকায় বক্ষ বিদ্ধ করে সেই রক্তে লিখল দু'ছত্র কবিতা। সেদিন শাহজাদার বিরহ সংগীতের উত্তর সে দিতে পারেনি, কিন্তু আজ দিলে।

পরব্রন মন নী অম্ কি ব-য়ক্ শু'অল জান্‌দিহম্।
শম্' অম্ কি শব্ ব-সূজ. ম্ ব্র দম্‌নী আব্রম্

তুমি পতঙ্গের মত একদিন আমার বিরহে পুড়ে মরতে চেয়েছিলে

সখা, কিন্তু 'আমি পতঙ্গ নই যে আগুনে পুড়ে মরব। আমি মোমের বাতির মত তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে যাব, তবু আমার ব্যথার একটি কথাও কাউকে বলব না।'

রক্তের রঙে পত্র লিখন শেষ করে তাদের প্রিয় অলিন্দে একটি পাথর চাপা দিয়ে বেরিয়ে এল মেহেরউন্নিসা। পশ্চিম আকাশে তাকিয়ে দেখল রক্তক্ষরা চাঁদ তারই ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি এঁকে অস্তে চলেছে।

এরপর বাংলাদেশের বর্ধমান বিভাগে চলে এসেছিল মেহের-উন্নিসা। কিন্তু জাহাঙ্গীরের অকৃত্রিম প্রেম তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল রাজধানী আগ্রায়। মেহেরউন্নিসা প্রথমে চায়নি ফিরে আসতে। কারণ তাদের প্রণয়ের বিনিময়ে নিরীহ শের আফগানকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। জাহাঙ্গীর সম্রাট হয়ে বৈমাত্রেয় ভাই বাংলার সুবাদার কুতুবদ্দীনের সঙ্গে পরামর্শ করে এক ষড়যন্ত্র করলেন। নিরপরাধ শের আফগানকে শেষে মেহেরউন্নিসা আর জাহাঙ্গীরের প্রেমকে জয়যুক্ত করবার জন্য প্রাণদান করতে হল।

তাই মেহেরউন্নিসা তাদের এই অভিশপ্ত প্রণয়ের গ্রন্থী বাঁধতে চাইল না। কিন্তু কালে সব ভুলে যেতে হল। আগ্রার উচ্ছল যমুনার ঢেউ আবার তার হৃদয়ের কূলে এসে আছড়ে পড়তে লাগল। বাদশাহ জাহাঙ্গীর আকুল প্রার্থনায় আহ্বান জানালেন। মেহেরউন্নিসা আগ্রায় ফিরে গেল। এবার আর তিনি মেহেরউন্নিসা রইলেন না; হলেন নূরমহল বা প্রাসাদের আলো। তারও পরে সাম্রাজ্যের একচ্ছত্রকর্ত্রী নূরজাহান বা জগতের আলো।

মেহেরউন্নিসা ফিরে এসেছিল আগ্রায়, কিন্তু ফেরেননি গীতকার পয়গল খাঁ। তিনি বাংলা মুল্লুকেই থেকে গেলেন। সংগীতের মাঝে তিনি আল্লাকে দেখতে পেয়েছিলেন, তাই রূপময় বাংলাদেশের শ্যামল প্রকৃতির বুকেই তিনি তাঁর সাধনার আসনটি পাতলেন।

যাবার সময়ে মেহেরউন্নিসা গুরুকে একটি বিস্তীর্ণ জায়গীর দান করে গেল। আল্লার প্রতিনিধিরূপে পয়গল খাঁ সেই জায়গীর পরিচালনা করতে লাগলেন। প্রথম বাংলাদেশে এসে যে ভগ্ন মসজিদে বসে তিনি নামাজ পড়েছিলেন আজও সেই মসজিদেই আল্লার দীন সেবকরূপে এসে তিনি প্রার্থনা করেন। অতি প্রত্যূষে যখন তিনি আজান ডাকেন তখন বরুজ নদীর ওপারে বহু দূর-দূরান্তের লোকে তা মুগ্ধ হয়ে শোনে। তারা বলতে থাকে, ফকীর সাহেব মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর জগতে জাগতে বলছেন।

সেদিনও প্রত্যহের মত আল্লার দয়া ভিক্ষা করছিলেন পয়গল খাঁ। আজান শেষ হলে নেমে এসে দেখেন মসজিদের দক্ষিণ দিকের দাওয়ায় একটি মেয়ে বসে আছে।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে মা তুমি, কোত্থেকে আসছো ?

সেই প্রশান্ত মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ের কোন কারণ দেখতে পেল না মেয়েটি।

সে ধীরে ধীরে বললে, দুখিনীর নাম কর্পূরমঞ্জরী, বাবা।

তিন

পয়গল খাঁ দেখলেন মেয়েটির পরনের কাপড়খানা কাদায় ভরে গেছে। কোথাও কোথাও ছিঁড়েও গেছে। মেয়েটির মুখ দেখে তাকে ভদ্রঘরের বলেই মনে হল। এবার খাঁ সাহেব কর্পূরমঞ্জরীকে বললেন, কোথায় যাবে মা ?

বৃদ্ধ ফকীরের কথার ভেতর স্নেহের এমন তাপ ছিল যা কর্পূরমঞ্জরীর বুকে জমে-ওঠা কান্নার স্তূপকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিলে।

সে মসজিদের দাওয়ার ওপর মাথা রেখে কতক্ষণ ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

পয়গল খাঁ বুঝলেন মেয়েটি বড় দুঃখে গৃহত্যাগ করেছে। যাবার কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই। তিনি বললেন, তোমাকে বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে, তুমি কি আমার সঙ্গে আমার ঘরে আসবে মা?

মানুষ যে এমন করে মানুষকে এই অবস্থায় আশ্রয় দিতে পারে তা যেন কর্পূরমঞ্জরীর কাছে অভাবনীয় বলে মনে হল। সে এই মানুষটিকে মনে মনে প্রণাম জানিয়ে উঠে দাঁড়াল। মাথা নেড়ে জানাল যে সে তাঁর সঙ্গে যেতে চায়। ফকীর সাহেব আগে আগে চললেন, কর্পূরমঞ্জরী পায়ে পায়ে তাঁকে অনুসরণ করে চলল।

সারারাত দারুণ বিভীষিকা আর উত্তেজনার মাঝে সে পথ চলেছে। পিচ্ছল পথে কতবার পড়েছে আছাড় খেয়ে। ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তার দেহ। কিন্তু ভয় আর উত্তেজনার মাঝে এতক্ষণ সে একেবারেই ভুলে ছিল তার আঘাতের কথা। এখন নতুন করে পথ চলতে গিয়ে সারাটা শরীরে দারুণ এক যন্ত্রণা অনুভব করল। পায়ের ব্যথাটাই তার অসহ্য বলে মনে হচ্ছিল। পয়গল খাঁ এগিয়ে গিয়েছিলেন কিছুপথ। একসময় পেছনে পায়ের সাড়া না পেয়ে তাকালেন। মেয়েটি পিছিয়ে পড়েছে। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। কর্পূরমঞ্জরী কয়েক পা অতি কষ্টে এগিয়ে এসে খাঁসাহেবের একটু দূরে পায়ে হাত দিয়ে বসে পড়ল।

পয়গল খাঁ তার কাছে এগিয়ে এলেন।

কি মা, পায়ে আঘাত লাগল নাকি? উদ্বিগ্ন খাঁ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

বাবা, আমি যে আর চলতে পারছি না! করুণ দৃষ্টিতে কর্পূরমঞ্জরী তাকাল খাঁ সাহেবের দিকে।

খাঁ সাহেব মেয়েটির কাছে বসে পড়লেন। কর্পূরমঞ্জরী তার

পায়ের তলাটা মেলে ধরল। কি দশা হয়েছে তার পায়ের। দুজনেই শিউরে উঠল। সারারাত কর্দমাক্ত পথে দৌড়ে আসতে গিয়ে পায়ের তলাটা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। খাঁ সাহেব বললেন, তুমি এখানেই একটু অপেক্ষা কর মা, আমি এখুনি ফিরে আসছি।

কর্পূরমঞ্জরীকে সেই বনের পথে বসিয়ে রেখে খাঁ সাহেব কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পয়গল খাঁ চলে যাবার পর কর্পূরমঞ্জরী চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। উঁচু বালুকাময় ভূমি। সেই বালুভূমির ওপর বাদাম, বুনোজাম আর কাঁটা বাঁশের জটলা। এখানে ওখানে ঝাঁটি আর রঙনের ফুল ফুটে রয়েছে। স্থানটি একেবারেই নির্জন। কাছে পিঠে কোন লোকালয় আছে বলে মনে হল না।

বনের আড়ালে সূর্যোদয় হচ্ছিল, তার রাঙা আলো ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে।

কর্পূরমঞ্জরীর কেমন ভয় করতে লাগল। রাতের আঁধারে নিজেকে সবার চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখার যে সুযোগ তার ছিল এখন আর তা রইল না।

দিনের আলোয় সবকিছু স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে। ঝাঁক ঝাঁক পাখী মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। এখুনি হয়ত লোক চলাচল শুরু হবে। সবাই তাকে দেখে ফেলবে, সবাই তার কথা হয়ত জেনে ফেলবে। কর্পূরমঞ্জরী ঘামতে লাগল সেই বালু-পথের ওপর বসে বসে।

তার চিন্তায় আর একটা ছবি ভেসে উঠল। এতক্ষণে হয়ত চিতা সাজান হয়েছে। কিন্তু মৃতদেহ তার ওপর শোয়ান হয়নি। এখনও তাকে পাওয়া যাবে এই আশা করছে সবাই। লোকজন হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছে তাকে এদিক ওদিক।

পাড়াপড়শীরা এখন তার কথা নিয়েই আসর পেতে বসেছে।

সে যে মাতৃপিতৃকুল আর শ্বশুরকুলের মুখে কালি দিয়েছে তা সাড়ম্বরে তারা প্রচার করছে। পাড়ার উৎসাহী যুবকেরা তাকে নিশ্চয়ই খুঁজে আনবার পণ নিয়ে বেরিয়েছে। একবার তাকে পেলে হয়। চিতার সঙ্গে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলবে। তারপর কাঠের পর কাঠ এনে চাপাবে তার ওপর। আর সব শেষে জ্বেলে দেবে আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলেপুড়ে···। নাঃ আর ভাবতে পারে না কর্পূরমঞ্জরী। সে সত্যিই ভয় পেয়ে গেছে এবার। পথের ওপর বসে থাকলে যদি কেউ তাকে দেখে ফেলে, তাই সে দেহটাকে টেনে টেনে কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে সে শুনতে পেল কারা যেন পথের ওপর দিয়ে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। সে প্রায় দম বন্ধ করে রইল। যদি কেউ তাকে দেখে ফেলে, আর তারা যদি তাদেরই গাঁয়ের লোকজন হয়! কর্পূরমঞ্জরীর সমস্ত শরীরটা কাঁপতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে সে শুনতে পেল তারই নাম ধরে কে যেন ডাকছে। এই গলার স্বরে নিষ্ঠুরতার কোন পরিচয় ছিল না। তার মনে পড়ে গেল ফকীর সাহেবের কথা। এতক্ষণ নিজের চিন্তায় সে এমনি ডুবে গিয়েছিল যে ঐ মানুষটির কথা সে বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল। এখন ঝোপের থেকে খানিকটা মুখ বাড়িয়ে দেখল কর্পূরমঞ্জরী। অদূরে পথের ওপর একটি পালকির পাশে দুটি বেয়ারা দাঁড়িয়ে। ফকীর সাহেব দুটি হাতের মাঝে শাঁখ বাজানোর ভঙ্গীতে মুখ রেখে ডাক দিচ্ছেন তার নাম ধরে।

কর্পূরমঞ্জরী ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে বলল, এই যে আমি এখানে ফকীর বাবা।

পয়গল খাঁ তাকে হাতের ইশারায় সেখান থেকে নড়তে বারণ করলেন। তারপর বেয়ারা দুটো পালকি কাঁধে নিয়ে কর্পূরমঞ্জরীর সামনে এসে হাজির হল।

কর্পূরমঞ্জরীকে খাঁ সাহেব হাতে ধরে পালকিতে তুলে দিলেন।

তারপর বেয়ারারা পালকি কাঁধে রওনা দিল। খাঁ সাহেব পেছন পেছন চললেন।

পালকির ফাঁক দিয়ে কর্পূরমঞ্জরী দেখল, বেয়ারারা তাকে নিয়ে অনেক উঁচু বালিয়াড়ির ওপরে উঠছে। বালুস্তূপের ওপরে বিশেষ কোন গাছপালা নেই। ছোট ছোট গুল্মের জটলা আর দু' চারটে ফণীমনসার গাছ ইতস্ততঃ মাথা তুলে আছে।

বালিয়াড়ির চূড়ায় উঠে এবার পালকি নামতে লাগল ঢালু পথে। এই ঢালু পথ ক্রমশ অনেক নীচে নেমে গেছে। ওপর থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে কর্পূরমঞ্জরী দেখল এখানেও তেমনি বন। আর বনের ওপারে খানিকটা স্বর্ণাভ বালুর চর। তারপরেই একটি নদী পূব থেকে পশ্চিমে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। দূর থেকে নদীটিকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। যেন একছড়া বেল ফুলের মালার গ্রন্থি ছিঁড়ে কেউ পথের ওপর এলোমেলোভাবে ফেলে রেখে গেছে।

পালকি নীচে নেমে এল, আর গাছের জটলার মাঝখানে নদীটি হারিয়ে গেল। সামান্য কিছুপথ গিয়েই পালকি বাঁক নিয়ে এসে দাঁড়াল এক বিরাট কোঠাবাড়ীর সামনে। কর্পূরমঞ্জরী অবাক হয়ে গেল বনের ভেতর এত বড় বাড়ী দেখে। সিং-দরজাকে বাঁয়ে রেখে একটা পুকুরের পাশ কাটিয়ে পালকি বাড়ীর পেছনে এসে থামল।

কর্পূরমঞ্জরী দেখলে একটি প্রৌঢ়া এগিয়ে এলেন। তাঁর নির্দেশে পালকি মাটিতে নামান হল। বেয়ারারা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এসেছিল, ফকীর সাহেবের পক্ষে এত তাড়াতাড়ি আসা সম্ভব হয়নি। পালকির ভেতর বসে কর্পূরমঞ্জরী তাঁকে খুঁজতে লাগল। সামান্য একজন সাধুর দয়ায় প্রথমে সে মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এ যেন পর পর তার কাছে কেমন একটা রহস্যের ব্যাপার বলে মনে হতে লাগল। পায়ের তীব্র যন্ত্রণার জন্য পালকিতে উঠে

সে একটু আরামই পেয়েছিল। এখন বিরাট এক বাড়ীর সামনে এসে সে একেবারে হকচকিয়ে গেল। তার বিস্ময় ভাঙল প্রৌঢ়ার ডাকে, নেমে এস মা, এ-বাড়ীতে তোমার কোন ভয় নেই। আশ্চর্য সুর এই মহিলাটির গলায়। ফকীরের কথায় যে দরদ সে দেখেছে এই প্রৌঢ়ার ডাকেও যেন তেমনি এক মমতা মাখান ছিল।

কর্পূরমঞ্জরী পালকি থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। সে চেষ্টা করেও ভাল করে দাঁড়াতে পারছিল না, মহিলাটি তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন।

অন্দর মহলে চার পাঁচ খানা ঘর আর এক ফালি জমি পেরিয়ে সে যে ঘরে এসে উঠল সে ঘরখানা মূল মহলের থেকে একটু দূরে বিচ্ছিন্ন।

ঘরখানা ছোট কিন্তু খুবই পরিষ্কার। ঘরের চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, সামনে উঠোন। উঠোনের একদিকে একটি তুলসীমঞ্চ আর একদিকে একটা যুঁইফুলের ঝাড়। ঘরে ঢোকার আগেই এগুলো চোখে পড়ল কর্পূরমঞ্জরীর। মুসলমানের ঘরে তুলসীমঞ্চ দেখে সে খানিকটা অবাক হয়েছিল, কিন্তু কোন প্রশ্ন করার মত অবস্থা তার তখন ছিল না। সারা গায়ে অসহ্য একটা যন্ত্রণা তাকে অস্থির করে তুলেছিল। প্রৌঢ়া মহিলাটি তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ঘরের ভেতর একটি চৌকিতে বিছানা পাতা ছিল। মহিলাটি বললেন, নতুন কম্বল আর চাদর দিয়ে বিছানা পেতেছি মা, মনে কোন দ্বিধা না রেখে তুমি এখানে বিশ্রাম করতে পার।

কর্পূরমঞ্জরীও তখন একটা আশ্রয়ই চাইছিল। সে বিছানার ওপর উঠে বসল। প্রৌঢ়া বললেন, সংকোচ কি মা, এ তোমারই ঘর। যতকাল সুস্থ না হও এখানেই থেকো। এই বলে তিনি কর্পূরমঞ্জরীকে ধরে বিছানার ওপর শুইয়ে দিলেন। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেলেন।

কর্পূরমঞ্জরী বিছানায় শুয়ে আর কোনকিছু ভাবতে পারল না।

মৃত্যুর পুরী থেকে হঠাৎ এই জায়গায় এসে তার প্রথম মনে হল যেন সে একটা স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু তারপর আর কিছু ভাবার আগেই সে ক্লান্তিতে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তার পূর্বাপর স্মৃতি সব যেন বিলুপ্ত হয়ে এল।

মাঝে একবার যেন কাদের সে ঘরে ঢুকতে দেখেছিল। তাকে তুলে ধরে খানিকটা গরম দুধ কে যেন খাইয়ে দিয়েছিল। পায়ে কি একটা প্রলেপও দিয়েছিল কেউ। তারপর আর কিছু মনে নেই তার।

জ্বরের ঘোরে সে শুধু বিভীষিকা দেখল। চিতা সাজান হয়েছে, তাকে সবাই মিলে ধরে নিয়ে গেছে সেখানে। ব্রাহ্মণেরা চিতার কাছে বসে মন্ত্র পড়ছে। সে মন্ত্রের অর্থ সে বুঝতে পারছে না। শুধু মনে হচ্ছে যেন মন্ত্র পড়ে তারা অদৃশ্য কোন এক ভীষণ দেবতাকে ডাক দিচ্ছে। তার সমস্ত শরীর জুড়ে একটা ভয় প্রবল রোমাঞ্চ তুলে খেলে বেড়াতে লাগল।

তারপর কর্পূরমঞ্জরী দেখলে সেই মানুষটাকে। দিনের আলোয় যাকে সে কোনদিন দেখেনি আজ প্রখর আলোয় তাকে দেখতে পেল। মুখখানা কুঁকড়ে ফ্যাকাশে হয়ে কি বীভৎস দেখাচ্ছে!

প্রতি রাতে যে মানুষটা মাতাল হয়ে ঘরে ফিরে তার ওপর মারধোর করত, সে আজ কি মন্ত্রবলে একেবারে স্থির হয়ে গেছে! সবাই মিলে মৃত মানুষটাকে তুললে চিতার ওপর। আবার কতক্ষণ মন্ত্র পড়া চলল। তারপর তাকে নিয়ে গেল সবাই সেই মৃতদেহটার কাছে। সে কত করে বলবার চেষ্টা করল, ওগো, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, তোমাদের পায়ে পড়ি আমায় ছেড়ে দাও। আমি এ গাঁয়ে, এ দেশে থাকব না, তোমরা আমায় পুড়িয়ে মেরো না।

কিন্তু কি নিষ্ঠুর মানুষগুলো! তাকে শক্ত করে নিয়ে গিয়ে চিতার কাঠের সঙ্গে বেঁধে ফেললে। তারপর চারদিকে আগুন ধরিয়ে দিলে। ধোঁয়ায় তার দম বন্ধ হয়ে আসছে—একটু বাতাস,

একটু জল ! ভীষণ একটা চীৎকার করে কর্পূরমঞ্জরী জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

জ্ঞান যখন তার ফিরল তখন সে দেখল ফকীর সাহেবের ছোট্ট ঘরখানার ভেতরেই সে শুয়ে আছে। মাথার কাছে বসে আছেন খাঁ সাহেব। তাকে স্বাভাবিকভাবে তাকাতে দেখেই খাঁ সাহেব ঘরের ওদিকে কাকে যেন কি নির্দেশ করলেন। একটি মেয়ে এগিয়ে এল খানিকটা জল নিয়ে। হিন্দুর মেয়ে, সিঁথিতে সিঁদুরের দাগ রয়েছে। সে জলের পাত্র থেকে কর্পূরমঞ্জরীর মুখে খানিকটা জল ঢেলে দিলে। কর্পূরমঞ্জরী সে জলটুকু খেয়ে বেশ সুস্থবোধ করল। তারপর কি একটা ওষুধ নিয়ে এসে খল থেকে তা চেটে নিতে বলল মেয়েটি। কর্পূরমঞ্জরী তাই করল।

মেয়েটি এবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কর্পূরমঞ্জরী সব ঘটনাটা একবার ভেবে নিলে মনে মনে। মাথার কাছে বসে আছেন সেই ফকীরবাবা। কর্পূরমঞ্জরী চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকাল।

একটু সুস্থ বোধ করছ মা? মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন খাঁ সাহেব। কর্পূরমঞ্জরী মাথা নেড়ে জানাল, সে ভাল বোধ করছে।

সারাদিন তেমনি বিছানায় শুয়ে রইল সে। কিন্তু শরীরে আর কোন গ্লানি বোধ করল না। সেই প্রৌঢ়া মহিলাটি এলেন! মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন।

আবার এল সেই মেয়েটি, সিঁথিতে সিঁদুর, রেকাবীতে ফল মিষ্টি আর এক হাতে একপাত্র দুধ।

খিদে পাচ্ছিল তার। ওঠার চেষ্টা করতেই বারণ করল সবাই। শুয়ে শুয়ে খেতে হল তাকে। ঐ মেয়েটিই খাইয়ে দিলে।

পরের দিন সে প্রায় আগের মতই সুস্থ বোধ করল। এখন সে নিজেই উঠে বসল বিছানার ওপর। যে মেয়েটি তার খাবার নিয়ে এল, তার কাছ থেকে সে জানল যে আজ সাতদিন একই বিছানায় জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন অবস্থায় সে পড়ে আছে।

কথায় কথায় কর্পূরমঞ্জরী মেয়েটির কাছ থেকে জানল পয়গল খাঁর পরিচয়। বিশাল জায়গীরের অধিকারী হয়েও আল্লার দীনসেবকের মত তিনি জায়গীর পরিচালনা করেন। নদীর ওপারে হিন্দু মুসলমান সকল প্রজাই তাঁকে ফকীরসাহেব বলে গভীর শ্রদ্ধা করে থাকে।

পয়গল খাঁ হিন্দুদের জন্য এই বাগানওয়ালা ছোট্ট ঘরখানি তৈরি করেছেন। তাঁর হিন্দু প্রজারা কাজেকর্মে এসে এই ঘরে কখনো কখনো থেকে যায়। ঘরখানার পাশেই আলাদা রান্নার জায়গাও রয়েছে।

কর্পূরমঞ্জরী মেয়েটির পরিচয় নিয়ে জানল, সে তারই সেবার জন্য নিযুক্ত হয়েছে। নদীর ওপারে তার বাড়ী। খাঁ সাহেবের সেরেস্তায় তার স্বামী সামান্য মুহুরীর কাজ করে থাকে।

খাঁ সাহেবের কথা বলতে গিয়ে মেয়েটির চোখে মুখে যে শ্রদ্ধার ভাবটুকু ফুটে উঠেছিল, কর্পূরমঞ্জরী তা লক্ষ্য করল। তাই সে মনে মনে মানুষটিকে আবার প্রণাম জানাল।

আচ্ছা ভাই, ওই যে আর একটি বয়স্কা মহিলা রয়েছেন, উনি কে? জিজ্ঞেস করল কর্পূরমঞ্জরী মেয়েটিকে।

উনিই ত খাঁ সাহেবের বিবি। ফতেমা বিবি।

কর্পূরমঞ্জরী এ গৃহে প্রবেশের সময় থেকে নানা সময়ে এই মহিলাকে তার কাছে দেখেছে। মহিলাটি কথা কম বলেন, কিন্তু তাঁর প্রতিটি আচরণ মনের ভেতর গভীরভাবে দাগ টেনে দিয়ে যায়।

নিজের কথা ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য হল কর্পূরমঞ্জরী। কুলীন বামুনের মেয়ে সে। জীবনে কখনো মুসলমান বাড়ীতে তাকে উঠতে হবে এ ছিল তার কল্পনারও অতীত। কিন্তু ভাগ্য কি বিচিত্র পথে তাকে এখানে নিয়ে এসে ফেলেছে।

ভাবতে গিয়ে একটি সত্য তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

মানুষের তৈরি এই জাতের বেড়া একদিন মানুষই ভেঙে ফেলে তার প্রয়োজনে। যেখানে মানুষ ভালবাসা দেয় সেখানে মানুষকে কোন জাতের চিহ্ন দিয়ে আলাদা করে রাখা যায় না। সে শুধু মানুষের বন্ধু বলেই পরিচিত হয়। খাঁ সাহেব আর তার বিবিকে সেই গোত্রে ফেলে একটা তৃপ্তি অনুভব করল কর্পূরমঞ্জরী।

এ সকল কথা আজ বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে আসছে কর্পূর-মঞ্জরীর। কোন দিন সে এ চিন্তা করেনি। তার চারদিকের সমাজ বা মানুষ তাকে এ পথে চিন্তা করতে শেখায়নি। কিন্তু তবু তার মনে এই সব চিন্তা আসতে লাগল। আর এই ধরনের ভাবনা ভাবতে গিয়ে সে নতুন একটা জীবনের স্বাদ পেল।

ঘরে তখন কেউ ছিল না, কর্পূরমঞ্জরী বিছানার ওপর উঠে বসল। এসে অবধি পায়ের দিকের একটা জানালা বন্ধ থাকতে সে দেখেছে। ওদিকটাতে কি আছে দেখবার এতদিন সুযোগ পায় নি। অবশ্য অসুস্থ অবস্থায় তা নিয়ে কোন কিছু ভাবাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসার পর থেকে সে মাঝে মাঝে একটা নূপুরের ধ্বনি শুনতে পেয়েছে। আর তার সঙ্গে কখনো দু' এক কলি গানের সুরও ভেসে এসেছে তার কানে।

এই সুরের জগতটা তার এই ছোট্ট ঘরের কাছে পিঠেই কোথাও আছে বলে তার মনে হল। সে পায়ের কাছের বন্ধ জানালার কপাট একটুখানি ফাঁক করে ধরল। সত্যি, আশ্চর্য এক জগৎ যেন তার চোখের সামনে হঠাৎ জেগে উঠল।

যে নদীটিকে সে বালিয়াড়ীর ওপর থেকে পালকির দরজা ফাঁক করে দেখেছিল, সেই নদীটিই পরিষ্কার দেখতে পেল সে এই জানালার ভেতর দিয়ে। আসার সময়ে খাঁ সাহেবের মহলের এ দিকটাতে তার একেবারেই নজর পড়ে নি। নদীটি খুব বেশী দূরে নয়। পাল তোলা দু' একটা নৌকো সে স্পষ্ট দেখতে পেল জানালার ফাঁকে। কিন্তু আর একটি দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

তার ঘর আর নদীর মাঝামাঝি জায়গায় আর একখানা মনোরম কোঠাবাড়ী। খাঁ সাহেবের এ মহল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

সাদা মিনারওয়ালা এমন চমৎকার বাড়ী জীবনে কখনো তার দেখার সুযোগ ঘটেনি।

একটি জানালা খোলা ছিল বাড়ীটার। সেই জানালা দিয়ে বাড়ীর ভেতর কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছিল।

কর্পূরমঞ্জরী দেখতে পেল একটি মেয়ে ঘরের ভেতর নাচছে। তার সঙ্গে মাথা দুলিয়ে সংগত করছে আর একটি লোক। মাঝে মাঝে মিষ্টি সুরে খুব দ্রুত কি যেন বলে যাচ্ছে।

সব কথা শুনতে পাচ্ছিল না কর্পূরমঞ্জরী, কিংবা মেয়েটির নাচও সবটুকু দেখা সম্ভব ছিল না। ঘরের ভেতর যতটুকু চোখ পড়ছিল তাতেই সে বুঝতে পারল নাচ গানের একটা আসর বসেছে, আর যে মেয়েটি নাচছে সে মেয়েটি বয়সে কিশোরী—সুন্দরীও বটে।

পায়ের সাড়া পেয়ে কর্পূরঞ্জরী জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে তার অবাক করা জগতটাকে মুছে দিল।

খাঁ সাহেব ঘরে ঢুকলেন।

কেমন আছ মা কর্পূর? খবর নিলেন খাঁ সাহেব।

বেশ সুস্থ বোধ হচ্ছে, বাবা।

কোন যন্ত্রণা কিংবা জ্বর ভাব নেই ত মা?

তেমন কিছু ত মনে হচ্ছে না।

কপূরমঞ্জরীর কথায় আশ্বস্ত হলেন খাঁ সাহেব। ঘরের ভেতরে একটি ছোট্ট কুশন টেনে নিয়ে তার ওপর বসলেন তিনি। সামনেই খাটের ওপর নতমুখে বসেছিল কর্পূরমঞ্জরী। হিন্দু ঘরের বধূ, তাই সঙ্কোচ ভাবটা একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

খাঁ সাহেব এবার ধীরে ধীরে কথা শুরু করলেন—নিজের কোন ছেলেমেয়ে নেই আমার। তাই আল্লা যখন কৃপা করে কাউকে কাছে এনে দেন তখন আল্লার দেওয়া স্নেহ আর সেবাটুকু

আর ওপরেই ঢেলে দিই। তুমি আমার সেই কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে মা।

কর্পূরমঞ্জরীর চোখে জল এল। আঁচলে চোখ মুছে সে বলল, আমি বড় ভাগ্যহীনা বাবা। সারা জীবনটা আমার অভিশাপে ভরা।

কিসের অভিশাপ মা? সমবেদনার সুরে প্রশ্ন করলেন খাঁ সাহেব।

আমার কথা শুনলে অকল্যাণ হবে বাবা, কর্পূরমঞ্জরীর স্বর ভাবাবেগে গাঢ় হয়ে এল।

আল্লার রাজ্যে কোন অকল্যাণ নেই মা। সমস্ত পাপীতাপীর গ্লানি আর মনের জ্বালা দূর করবার জন্য কি অফুরন্ত আয়োজন তাঁর! আল্লার কথায় ফকীর সাহেব তদ্গত হয়ে গেলেন। তিনি বলতে লাগলেন, ভোরের আলোটুকুর দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে দেখ মা, মনের সব আঁধার দূর হয়ে যাবে। একটু ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ নাও, অমনি দেখবে সব জ্বালা তোমার কেমন করে জুড়িয়ে গেল। একটি পাখির গান শুনে যে মুগ্ধ হতে পারে মা, আল্লার দুয়ার থেকে তার পথ ত বেশী দূর নয়।

এবার খাঁ সাহেবের দিকে মুখ তুলে তাকাল কর্পূরমঞ্জরী। কি প্রশান্ত এই মানুষটি। চোখ দুটিতে যেন ক্ষমা আর করুণা উপছে পড়ছে। কর্পূরমঞ্জরী মনে করল, তার সব গ্লানিটুকু এঁর কাছে উজাড় করে দিলেই তবে শান্তি পাওয়া যাবে। যতক্ষণ সে নিজেকে সবার আড়ালে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল ততক্ষণ মনের মধ্যে একটুও শান্তি ছিল না তার। কেবল একটা অদৃশ্য ভয় তাকে সারাক্ষণ শঙ্কিত করে রেখেছিল। কর্পূরমঞ্জরী এবার দৃঢ় করল নিজেকে।

তার পালিয়ে আসার ইতিহাসটুকু সে আজ এই ফকীর মানুষটির কাছে বলবে। তাতে এখানে যদি তার ঠাঁই না মেলে তবুও সে

বলবে সে কথা ! অন্ততঃ কথাটুকু বলে সে মনের অসহ্য গোপনতার যন্ত্রণা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবে।

কর্পূরমঞ্জরী বলল, বাবা, আপনি আমাকে মেয়ে বলেছেন, কিন্তু আমার জীবনের সব কথা শুনলে আপনি আমাকে আর এমন করে স্নেহ করতে চাইবেন না। তখন এই অভাগীর ওপর ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন।

কথা বলতে গিয়ে কেমন এক আবেগে কেঁপে উঠল কর্পূরমঞ্জরীর স্বর। সে যে কাজ করেছে তার ভেতর ছিল তার প্রাণ বাঁচানর তাগিদ। কিন্তু এখন সে নির্ভয় আশ্রয়ে এসে নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগল। যার জন্য সমাজ তাকে ক্ষমা করবে না সেজন্য ফকীর সাহেব তাকে ক্ষমা করবে একথা সে ভাবতেই পারল না।

মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল খাঁ সাহেবের মুখে। তিনি আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে বন্ধ জানালাটা নিজেই খুলে দিলেন। কর্পূরমঞ্জরীকে জানালার কাছে ডেকে বললেন, সামনেই যে নদীটি দেখছ, এটি বয়ে আসছে সাঁওতাল পরগণার পাহাড় থেকে। একবার সমতল পৃথিবীকে ভালবেসে সে যখন নেমে এসেছে তখন ফিরে যাবার পথটি ত তার বন্ধ হয়ে গেছে মা। এখন যতই সে এগুচ্ছে ততই তার আয়তন বেড়ে চলেছে। বিশাল সাগরের অথৈ জলে যতক্ষণ গিয়ে সে না পৌঁচোচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার যাওয়ার বিরাম কোথায় ?—থামলেন খাঁ সাহেব, তারপর সস্নেহে বললেন, স্নেহ যে মা সামনের ঐ নদীটির মত। একবার তা যখন বেরিয়েছে তখন তার ফেরার পথ চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে। দিনে দিনে সে শুধু বেড়েই চলবে। তোমাকে ঘৃণা করে মুখ ফিরিয়ে নেবার পথ যে আমার আগেই বন্ধ হয়ে গেছে মা।

কর্পূরমঞ্জরী বলল, আমি সমাজ ছেড়ে চলে এসেছি বাবা।

তাই ত মা তুমি আরও বড় একটা সমাজের মাঝখানে এসে

পড়লে। যে সমাজে শুধু মানুষ রয়েছে। সেই মানুষের সমাজের উদারতা আর আল্লার ছুনিয়ার অপার শান্তি এখানে।

একটু থেমে খাঁ সাহেব বললেন, আমি তোমার ইতিহাস কিছু কিছু জেনেছি মা। সাতটি দিন জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন থেকে তুমি নিজেরই অজানিতে তোমার সব কথাই বলে গেছে। আর তা জানার পর থেকে তোমাকে আরও বেশী করে স্নেহের পাকে জড়িয়ে ফেলেছি মা।

কর্পূরমঞ্জরীর মন থেকে যেন একটা গুরুভার নেমে গেল। পাখির মত হাল্‌কা মনে হল নিজেকে।

আচ্ছা বাবা, এই যে সমাজের শাসন ভেঙে নিজের প্রাণটুকুকে বাঁচাবার লোভে পালিয়ে এলাম, এতে কি কোন পাপ নেই ?

প্রাণরক্ষার দায়িত্ব নিয়েই ত সমাজের সৃষ্টি মা। সেই প্রাণকে হরণ করতে যখন সে এগিয়ে আসে তখনই সে সমাজের বেড়া ভাঙবার প্রয়োজন হয়। মানুষ নির্ভয়ে বাস করবে তার সমাজের ভেতর। কিন্তু সেই সমাজই যদি তার মানুষগুলির চারদিকে ভয়ের পাঁচিল তুলে দেয়, তাহ'লে সেই পাঁচিলে আলো বাতাস আর প্রাণের তাগিদে একদিন ফাটল ধরবেই।

কর্পূরমঞ্জরী বলল, আমি যে বাবা সমাজ ছেড়ে চলে এলাম, এখন আমার স্থান হবে কোথায় ? সমাজভ্রষ্টার কোথাও যে সম্মান নেই।

কর্পূরমঞ্জরীর কথায় একটা নির্মম সত্য ছিল, তাই খাঁ সাহেব কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন। পরে বললেন, মা, বহুকালের সংস্কার যারা ভাঙতে চায় তাদের প্রথম প্রথম ছুঃখবরণ করতেই হবে। তাদের এই ছুঃখের তপস্যা একদিন কল্যাণ নিয়ে আসবে। তখন আজ যাদের কপালে সমাজ কলঙ্কের কালি দিলে, আগামীদিন তাই হয়ে যাবে চন্দনের তিলক। মা, সমাজ ছেড়ে এসে অমূল্য প্রাণের প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছ, আজ নিজের ছুঃখের কথা ভেবে তাকে ছোট

করে দিও না। ক্ষুদ্র একটা সমাজ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে আজ তুমি বৃহৎ সমাজের মাঝখানে এসে পড়লে। এই বিরাট সমাজে চলবার অভিজ্ঞতা তোমার নেই, তাই প্রথমে কষ্ট পাবে, কিন্তু একদিন মা এই সমাজই তোমাকে গভীর শান্তি দেবে। তখন আজকের এই ক্ষুদ্র সমাজের আঘাত তোমাকে কোন দুঃখই দিতে পারবে না।

কর্পূরমঞ্জরী বলল, হিন্দু সমাজে কত মহাপুরুষই ত জন্মেছেন। কিন্তু তবু সমাজে নারীদের ওপর এ অত্যাচার কেন?

খাঁ সাহেব বললেন, হিন্দুদের আচারব্যবহার রীতিনীতি সম্বন্ধে আমি কতটুকুই বা জানি মা? তাই কোন মন্তব্য করা আমার সাজে না। তবে এই ভারতবর্ষে এক সময় এক মুসলমান পণ্ডিত ভ্রমণ করতে এসেছিলেন। তিনি আলবেরুণী নামে পরিচিত। হিন্দুদের সংস্কৃতি ও ধর্ম তিনি গভীরভাবে অনুশীলন করেছিলেন।

তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে হিন্দুদের কোন কোন গুণের যেমন প্রশংসা করেছেন, তেমনি তাদের সমাজ-ব্যবস্থার নিন্দাও করেছেন। তাঁর মতে পুরোহিত সম্প্রদায়ই মহান হিন্দুজাতির অধঃপতনের কারণ। মিথ্যা আচার অনুষ্ঠানের মাঝখানে সাধারণ মানুষকে তারা মোহগ্রস্ত করে রেখেছে; তাদের আওতায় সাধারণ মানুষ তাদের মুক্ত বিচারের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

আর নারীদের পরাধীনতার যে কথা তুমি তুলেছ তার মূলেও মনে হয় পুরুষের স্বার্থপরতাই কাজ করছে। যে স্ত্রী সংসারে দাসীর মত মুখ বুজে সব কাজ করে যাচ্ছে তারই চোখের ওপর স্বামী করছে ব্যভিচার! সেখানে নারীর চোখের জল ফেলা ছাড়া কোন উপায়ই নেই। প্রতিবাদ করতে গেলে পরিত্যক্ত হবার ভয় থাকে। তবে আল্লার রাজ্যে এ অবিচার বেশী দিন চলতে পারে না মা। একদিন এর শেষ হবে! নারী সমাজ তাদের নতমুখ তুলে নিজেদের শক্তিতেই আবার উঠে দাঁড়াতে পারবে।

ফকীর সাহেবের কথায় কর্পূরমঞ্জরীর মনে হল যেন অনাগত

দিনের একটা আলোর রেখা তার চোখে এসে পড়েছে। সেই আলোর পথ ধরে চললে সে এক বিরাট জীবনের সন্ধান পেতে পারবে।

কিছুক্ষণ নীরবতার মাঝে কাটল। এক সময় খাঁ সাহেব বললেন, মা তুমি আমার মেয়ে, তবু জাতিতে আমরা পৃথক। মুসলমানের ঘরে তুমি চিরদিন থাকতে পারবে না মা। এখানে আমার হিন্দু প্রজাপাটক, বন্ধুবান্ধব এসে থাকে। তারা তোমাকে এখানে দেখলে নানা কথা রটনা করবার সুযোগ পাবে।

এ অবস্থায় আমি কোথায় যাব বাবা? কর্পূরমঞ্জরীর গলায় আর্ত একটা সুর ফুটে উঠল।

হাসলেন খাঁ সাহেব, আমাকে নিষ্ঠুর ভেব না মা। লোকলজ্জার ভয়ে মেয়েকে পথের বার করে দেব এমন শিক্ষা আমি আল্লার কাছে পাইনি। তবে তোমারই মঙ্গলের জন্যে আমাকে একটু ভিন্ন রকমের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

কর্পূরমঞ্জরী চোখেমুখে জিজ্ঞাসা চিহ্ন এঁকে ফকীর সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল।

খাঁ সাহেব বললেন, এখান থেকে কিছু দূরে আমার জায়গীরেই রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের বাস। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কিছু সম্পত্তি দান করে একটি টোল প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছি। কয়েকটি ছাত্র আর তাঁর পরিবার নিয়ে তিনি সেখানে বাস করছেন। আমি তাঁর কাছে তোমার থাকবার ব্যবস্থা করেছি।

কর্পূরমঞ্জরী বলল, তিনি কি সমাজত্যক্তাকে ঠাঁই দেবেন বাবা?

এক্ষেত্রে একটু মিথ্যাচার করতে হয়েছে মা। সহমরণের ভয়ে তুমি যে সমাজ ছেড়ে চলে এসেছ একথা পণ্ডিত মশায়ের কাছ থেকে গোপন রাখতে হয়েছে। দরিদ্রঘরের ব্রাহ্মণ কন্যা পিতা আর বিমাতার তাড়নায় গৃহত্যাগ করে এসেছে এই তোমার পরিচয় দেওয়া হয়েছে সেখানে। ভট্টাচার্যের পরিবারে তুমি হবে মা সাহায্যকারিণী।

কয়েক দিন পরে এক অপরাহ্ণে কর্পূরমঞ্জরী যাত্রা করল তার নতুন আস্তানার উদ্দেশ্যে। নদীর ঘাট পর্যন্ত এলেন খাঁ সাহেব।

কর্পূরমঞ্জরীর চোখে জল। খাঁ সাহেব বললেন, যদি কোনদিন কোথাও কোন দুঃখ পাও মা, তাহলে তোমার এই বুড়ো ছেলের কাছে তখুনি চলে এস। আল্লা তোমায় দয়া করবেন।

নৌকো দাঁড় টেনে এগিয়ে চলল। যতক্ষণ দেখা যায় কর্পূরমঞ্জরী তাকিয়ে রইল ফকীর সাহেবের দিকে।

চার

আগেই ভট্টচার্য মশায়কে কর্পূরমঞ্জরীর যাওয়ার খবরটা দেওয়া হয়েছিল। প্রায় শেষরাতে ভট্টাচার্যের আস্তানার কাছে নৌকো ভিড়ল। বহু দূর পশ্চিমের হাটুরে নৌকোয় কর্পূরমঞ্জরী যাচ্ছিল। তাই আগে থেকেই নদীর ঘাটে ভট্টাচার্য মশায় তাঁর দুটি ছাত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

কর্পূরমঞ্জরী নৌকো থেকে নামতেই ছেলে দুটি খাঁ সাহেবের নাম করে তাদের পরিচয় দিল। তারপর তাদের সঙ্গে কর্পূরমঞ্জরী চলল আস্তানার দিকে। ছেলে দুটির ভেতর একটি বয়সে মনে হল কর্পূরমঞ্জরীর চেয়ে কিছু বড়ই হবে। অন্যটি বয়সে বালক। লাঠি হাতে আগে আগে চলল বড় ছেলেটি। মাঝে থেকে তাকে অনুসরণ করে চলল কর্পূরমঞ্জরী। পেছনে একটি পোঁটলা মাথায় ছোট ছেলেটি আসতে লাগল। পোঁটলাটিতে কর্পূরমঞ্জরীর কয়েকখানা কাপড় ছিল। আসার সময় খাঁ সাহেবের স্ত্রী ফতেমা বিবি তাকে কাপড়গুলি দিয়েছিলেন।

নৌকো থেকে নেমেই কর্পূরমঞ্জরী পোঁটলাটা নিজে নিতে

চেয়েছিল কিন্তু ছোট ছেলেটি তা হতে দিল না। সে তাড়াতাড়ি করে পোঁটলাটা নিজের মাথায় তুলে নিল।

পথ চলতে চলতে এক সময় কর্পূরমঞ্জরী ছেলেটিকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি নাম তোমার?

কোন্ নামটা বলব। আমার অনেকগুলো নাম আছে।

ছেলেটির কথা শুনে কর্পূরমঞ্জরীর খুব হাসি পেল। সে হাসি চেপে বলল, যে নামটা তোমার ভাল লাগে তুমি সেটাই বল।

বাবা ডাকেন ঘণ্টাকর্ণ বলে, সেটা মোটেই ভাল না। যখন পড়া পারি না তখন গুরুমশায় বলেন, মর্কটশর্মা। এ নাম কারু পছন্দ হয়? মা ডাকেন, মানিক বলে। আমার পুরো নাম শ্রীযুক্ত মানিকলাল গঙ্গোপাধ্যায় কিনা তাই। আচ্ছা আপনিই বলুন না, মানিক নামটা ভাল নয়?

কর্পূরমঞ্জরী গোলগাল ছেলেটিকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, সত্যি খুব সুন্দর নামটি তোমার। একেবারে মানিক তুমি।

নদীর ঘাট থেকে ভট্টাচার্য মশায়ের আস্তানা দূরে নয়। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা এসে পৌঁছল সেখানে। ভট্টাচার্য মশায় ভোররাতের ঘুমের আমেজটুকু উপভোগ করছিলেন তখন। ওদের ডাক তিনি শুনতে পেলেন না। দরজা খুলল যে মেয়েটি তার চোখেও ঘুম জড়িয়েছিল। একহাতে প্রদীপটা তুলে ধরে আঁচলে চোখ মুছে সে নবাগতাকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করল। কর্পূরমঞ্জরী দেখল তের চোদ্দ বছরের মেয়েটি চাঁপা ফুলের মত ফুটে উঠেছে। ছাত্র দুটি উঠোন পেরিয়ে ও পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। কর্পূরমঞ্জরী এগিয়ে মেয়েটির হাতের প্রদীপটা তুলে ধরে বলল, বাঃ, ঘরের ভেতরেই যে চাঁপা ফুল ফুটেছে। কি সুন্দর তুমি ভাই।

তোমাকে দেখে কিন্তু আমারও খুব ভাল লেগেছে। এসো দিদি, আমার সঙ্গে—মেয়েটি একহাতে প্রদীপ আর অন্যহাতে কর্পূরমঞ্জরীকে ধরে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল।

স্থানটি আশ্রমের মত। ঘরের এক কোণে পিলসুজের ওপর প্রদীপটি রেখে মেয়েটি বলল, এখনও ভোর হতে দেরি আছে, এস দিদি আমরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্প করি।

নৌকোতে অনেকটা রাত কেটেছে কর্পূরমঞ্জরীর, সে এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, বিশ্রামের কথায় তার ভালই লাগল। তারা দুটিতে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। তবে নতুন জায়গায় এসে কর্পূরমঞ্জরীর চোখে ঘুম এল না। আর নতুন সঙ্গীকে পেয়ে ভট্টাচার্য মশায়ের মেয়েটিও ঘুমুতে পারল না।

কি নাম তোমার ভাই, মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল কর্পূরমঞ্জরী।

মেয়েটি কর্পূরমঞ্জরীর হাতটা নিজের হাতের ভেতর টেনে নিয়ে বলল, বলব না। তুমি এত দেরি করে এলে কেন?

ও, তাই রাগ হয়েছে তোমার। কিন্তু নদীর জোয়ার-ভাঁটার ওপর আমার ত কোন হাত ছিল না ভাই। উজান ঠেলে আসতে নৌকোর দেরি হয়ে গেল।

আমি সেই কখন থেকে তোমার পথ চেয়ে বসে আছি। আচ্ছা নৌকোয় বসে আমার জন্যে তোমার মন কেমন করেনি?

কি উত্তর দেবে এর কর্পূরমঞ্জরী। সে খাঁ সাহেবের মুখে শুনেছিল ভট্টচার্য মহাশয়ের একটি মেয়ে আছে। সামান্য কৌতূহল হয়ত জেগেছিল তখন, কিন্তু তারপর আর কিছুই মনে ছিল না তার। নিজের অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তাতেই সে ডুবে ছিল সারাক্ষণ। মেয়েটির এই প্রশ্নে তাই তার মুখে হঠাৎ করে কোন উত্তর যোগাল না। পরে একটু ভেবে বলল, মন কেমন করছিল বৈকি ভাই, তোমার মত আমিও যে মাকে হারিয়েছি। মা-হারাদের কথা তাই আগেই মনে পড়ে যায়।

তুমি খুব ভাল ভাই। আমার নাম জানতে চেয়েছিলে না? স্বাহা আমার নাম।

নাম শুনে চমকে উঠল কর্পূরমঞ্জরী। অগ্নিতে ব্রাহ্মণেরা আহুতি দেবার সময়ে এই নামটি উচ্চারণ করে বলে, অগ্নয়ে স্বাহা। অগ্নির সঙ্গে এই মেয়েটির নাম যুক্ত দেখে কর্পূরমঞ্জরীর শরীরটা কেমন শিউরে উঠল।

কর্পূরমঞ্জরীকে চুপ করে থাকতে দেখে স্বাহা বলল, নামটা বুঝি তোমার পছন্দ হল না ভাই ?

আচ্ছা, এ পোশাকী নামে না ডেকে যদি তোমাকে একটা ঘরোয়া নামে ডাকি তাহলে তুমি সাড়া দেবে না ?

নতুন একটা নাম হবে ভেবে স্বাহা খুব খুশী হয়ে বলল, সে নামটা শুধু তোমারই জন্যে তোলা রইবে দিদি ?

কর্পূরমঞ্জরী হেসে বলল, হাঁ, আমার দেওয়া নাম অন্যে এঁটো করে দেবে এ আমি সইব না। সে নামে শুধু একজন ডাকবে, আর একজন সাড়া দেবে।

কি নাম রাখবে আমার দিদি ?

যেমন বরণ তেমনি গড়ন তোমার, তাই তোমায় ডাকব চাঁপা বলে।

স্বাহা কর্পূরমঞ্জরীর হাতে জোরে একটা চাপ দিল। সে যে এতে খুবই খুশী হয়েছে এটা তারই প্রকাশ।

যে দুটি ছেলে এখানে থাকে তাদের কথা তুলল কর্পূরমঞ্জরী। ছোটটির সঙ্গে ইতিমধ্যেই তার পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। স্বাহা বড়টির পরিচয় দিতে গিয়ে বলল, ধনপতি সেন ওর নাম। রায়পুরের জমিদারের ভাগ্নে। খুব দুষ্টুমি করত বলে ওর জমিদার মামা ওকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জমিদারের ভাগ্নে, কই দেখে ত মনে হয় না। বেশ সাদাসিধে দেখলাম, কর্পূরমঞ্জরী মন্তব্য করল।

থাকে ভালো ছেলের মত, কিন্তু রাগলে খাওয়া দাওয়া বন্ধ। একটি কথাও মুখ দিয়ে বেরুবে না। সাধ্যি সাধনা করেও কেউ

আর জলস্পর্শ করাতে পারবে না। শেষে যখন শুনবে স্বাহাও তার জন্যে সারাদিন উপোসী রয়েছে তখন কথা না বলে গুটি গুটি এসে পাত পেড়ে বসে যাবে। কথাগুলো বলতে বলতে হেসে সারা হল স্বাহা।

পড়াশোনায় কেমন?

কাব্যে পাঠ নিচ্ছে, বলল স্বাহা, আমি অতশত বুঝি না দিদি। তবে বাবা বলেন, ছেলেটি অব্রাহ্মণ কিন্তু শাস্ত্রপাঠে অনুরাগ আছে।

শুধু শাস্ত্রপাঠেই ব্রাহ্মণের মনোভাব তাই নয়, হেসে বলল কর্পূরমঞ্জরী, রাগের বেলাতেও দেখছি তাই।

স্বাহা বলল, ওর রাগের কথা আর বল না ভাই। স্নানের তেল ওকে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে ওর ঘরে। একদিন ভুলে গেলে আর রক্ষে নেই। চাইতে আসবে না ঘরের ভেতর। মাঘের শীতেও পুকুরে গলা জলে দাঁড়িয়ে স্নান করবে উখো মাথায় এক প্রহর ধরে। জলে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে কাব্যের শ্লোক আওড়াবে।

ছেলেটির অদ্ভুত আচরণে কর্পূরমঞ্জরী কৌতুক বোধ করল, কিন্তু পরক্ষণেই কি যেন মনে করে হেসে বলল, রাগটা ওর কার ওপর ভাই?

কি জানি দিদি, ও এমনিই—স্বাহার গলায় কপট ক্রোধের আভাস। আঁধার পাতলা হয়ে এসেছে। গাছের জটলার ভেতর থেকে কয়েকটা পাখি একসঙ্গে কলরব তুলে আবার থেমে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল স্বাহা।

তুমি শোও দিদি, বাবার ওঠার সময় হয়ে গেছে আমি জল দিয়ে আসি।

কর্পূরমঞ্জরীও বিছানার ওপর উঠে বসল। স্বাহা ঘাটে জল আনতে গিয়েছিল, ফিরে এসে বলল, দিদি তুমি যখন উঠেছ একবার এদিকে এসো দেখি। স্বাহার ডাকে কর্পূরমঞ্জরী উঠে গেল।

বাড়ীতে আগে ওঠে স্বাহা, কারণ বাবার সকালের জল ও দন্তমার্জনের ব্যবস্থাদি তাকেই করে দিতে হয়। তারপর ওঠেন ভট্টচার্য মশায়। তখনও রাতের আঁধার পুরোপুরি কাটে না। তারপর ডাক দেন ছাত্রদের। এই নিয়ম বহুদিন ধরে চলে আসছে। আজও তার ব্যতিক্রম হল না। ভট্টচার্য মশায় বিছানা ছেড়ে এসে উঠোনে জল চৌকি আর ঘটিটি পেলেন। দরজার কাছে রোজকার মত স্বাহা দাঁড়িয়ে আছে ভেবে বললেন, কই মা গামছাখানা দাও।

যথারীতি তাঁর হাতে গামছাখানা এগিয়ে দেওয়া হল। হঠাৎ মনে পড়ল ভট্টাচার্য মশায়ের গত রাত্রের কথা। অমনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কই মা স্বাহা, মেয়েটি আসেনি? ওরাই বা গেল কোথায়? ভারী চিন্তার কথা, রাতে ভিতে ফিরল না, এ যে বড় দুশ্চিন্তার কথা মা।

কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে তিনি কথাগুলি বলছিলেন সে মেয়েটি গড় হয়ে ভট্টচার্য মশায়কে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

আজ আবার এ কি হোল রে পাগলী, বলে ভট্টাচার্য মশায় মেয়েকে উঠিয়ে দেখেন তাঁর মেয়ের মুখখানা কেমন যেন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অমনি ঘরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে খিল খিল হাসিতে ফেটে পড়ল স্বাহা।

ভট্টাচার্য মশায় প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেন। তারপর ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়ে বললেন, তা তুমি এতদিন একাই ছিলে আমার দজ্জাল মেয়ে, এখন থেকে আর একটি লক্ষ্মী মেয়ে আমার হল।

কপট ক্রোধে স্বাহা বলল, বাবার ওপর আর কাউকে ভাগ বসাতে দিচ্ছিনে কিন্তু। শোন বাবা, হয় আমাকে নয় কর্পূরদিদিকে —যাকে খুশী একজনকে বেছে নাও। তোমার স্নেহের দু'জন ভাগীদার আমি রাখব না।

ভট্টাচার্য মশায় বললেন, পাগলী, দু'খানা হাত আছে বলে কি একটাকে অনাবশ্যক বলে কেউ কেটে বাদ দিয়ে দেয় রে!

স্বাহা বাবার কথার জবাব দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিল, অমনি কর্পূরমঞ্জরী চাপা গলায় বলল, স্নেহের কি পরিমাপ থাকে চাঁপা। যত ঢালা যায় ততই ভরে ওঠে। তোকে ভরে দিয়ে বাকী যতটুকু থাকবে সেইটুকু ভাগই না হয় আমি নেব। বাবার স্নেহ এককণা পেলেই আমার অনেক পাওয়া হয়ে যাবে।

মেয়েটির চেহারায় বেশ ভদ্র ঘরের ছাপ ছিল। তার ওপর মেয়েটির কথাবার্তায় খুব খুশী হলেন ভট্টাচার্য মশায়। ইতিমধ্যে স্বাহার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে দেখে বিশেষ তৃপ্তিও পেলেন মনে মনে।

তোমরা দুটি বোনে সংসার দেখ মা, আমি পরম নিশ্চিন্তে তাহলে পঠনপাঠনের কাজে লেগে যাই। অধ্যয়ন হল ধ্যান। সংসারে মন থাকলে ধ্যান করা যায় না মা।

ভট্টাচার্য মশায়ের পাঠের সময় হয়ে গিয়েছিল। তিনি পরম নিশ্চিন্তে পাঠগৃহে গিয়ে ঢুকলেন। স্বাহা কর্পূরমঞ্জরীর হাতে টান দিয়ে বলল, এসো আমার অংশীদার। স্নেহের আর কাজের ভাগ সমান সমান করে নিই।

দুজনে হাসতে হাসতে ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু গোল বাধল কাজ নিয়ে।

কর্পূরমঞ্জরী আজ যে কাজ করতে এগিয়ে যায় স্বাহা তাতেই বাধা দেয়। বলে, বাবাঃ, কি লোভী মেয়েকেই না ঘরে ঠাঁই দিলাম। আমার সব কাজগুলোতেই ওঁর নজর। দেখ, লক্ষ্মী মেয়ের মত হাত গুটিয়ে আজ চুপচাপ কাজগুলো দেখে যাও দেখি।

কর্পূরমঞ্জরী দু একটা কাজ কাড়াকাড়ি করেই করল। কিন্তু স্বাহা তার নতুন দিদিকে প্রথম দিন প্রায় কোন কাজেই হাত দিতে দিলে না।

তারপর সুখত্বঃখ, ক্রিয়াকর্মের মাঝে কেটে গেল কত দিন। প্রভাতের আলো কতবার ফুটে উঠল। ভট্টাচার্য মশায় ফিরে ফিরে কতবার সূর্যবন্দনা করলেন জলে দাঁড়িয়ে।

ছাত্ররা কতদিন পড়া আরম্ভ করল, আবার পড়া শেষ করে যে যার ঘরে ফিরে গেল। সন্ধ্যা নামল। শাঁখ বাজিয়ে দীপ জেলে তাকে ফিরে ফিরে বরণ করা হল। দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে ঋতু গড়িয়ে চলল। বর্ষার মেঘে জল পড়ল, বীজ বোনা হল মাঠে। ফসল উঠল হেমন্তের শেষে। অচেনা নতুন জায়গা কর্পূরমঞ্জরীর কাছে আজ আর নতুন নয়। যেন কতদিনের চেনা, কতদিনের পরিচিত এই সংসার, এই পৃথিবী।

সুখত্বঃখের ভেতর দিয়ে স্বাহা আর কর্পূরমঞ্জরী কত কাছে এসে গেছে। স্বাহা আজ শুধু তার ছোট বোন নয়, সে তার বন্ধুও। আত্মভোলা ভট্টাচার্য মশায় কর্পূরমঞ্জরীর আসার পর থেকে আর সংসারের কোন খোঁজ খবর নেন না। এখন সম্পূর্ণ পঠনপাঠনের মাঝেই তিনি ডুবে থাকেন। মাঝে মাঝে অনুভূতির সাগরে ডুব দিয়ে এক একটি শুক্তি তুলে আনেন। আর তার ভেতর মুক্তোর সন্ধান পেলেই ভাবাবেগে চীৎকার করে ওঠেন, মা কর্পূর, মা স্বাহা, কোথায় তোমরা এস এস, দেখে যাও মা কি রত্নের সন্ধান পেয়েছি। ওরা অমনি কাজ ফেলে ভট্টাচার্য মশায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তিনি আকুল হয়ে বলেন, দেখ্ দেখ্ মা, কি বলছেন হিমালয় সপ্তর্ষিদের। গিরিকন্যা উমাকে মহাদেবের জন্য প্রার্থনা করতে এসেছেন ঋষিকুল—

হিমালয় বলছেন,

'এহি বিশ্বাত্মনে বৎসে ভিক্ষাসি পরিকল্পিতা।
অর্থিনো মুনয়ঃ প্রাপ্তং গৃহমেধিফলং ময়া॥'

এস বৎসে! আমি তোমাকে মহাদেবের নিমিত্ত ভিক্ষা দিলাম। মহর্ষিগণ ভিক্ষা চাইছেন, আজ আমার গৃহীর চরিতার্থতা লাভ হল।

কন্যাকে ভিক্ষা দিচ্ছেন হিমালয়! আর প্রার্থনা করছেন মহর্ষিকুল! ভিক্ষার সামগ্রী হল কন্যা। কি মর্যাদা মা এই সামান্য 'ভিক্ষা' শব্দটির। ভিক্ষার সামান্য তণ্ডুল যে মা রত্ন মাণিক্যের চেয়ে সহস্রগুণ মূল্যবান। ভিক্ষার্থী যখন ভিক্ষা প্রার্থনা করে তখন তার প্রার্থনার ভেতর কি আকুলতা লুকিয়ে থাকে। আর যিনি দান করেন তিনি কৃতকৃতার্থ হয়ে যান।

উমা সেই ভিক্ষার মর্যাদা লাভ করলেন। এর চেয়ে গৃহীর কি আর সৌভাগ্য আছে মা?

বলতে বলতে চোখের জল মোছেন ভট্টাচার্য মশায়। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোকেও মা এমনি করে তুলে দিতে হবে প্রার্থীর হাতে। কবে সে সৌভাগ্যর দিন আমার আসবে মা, যেদিন তোকেও এমনি ভিক্ষারূপে দান করে ধন্য হয়ে যাব?

আত্মভোলা মানুষটি এমনি করে কাব্যপাঠ করেন। আনন্দের অনুভূতিগুলি যখন তীব্র হয়ে ওঠে তখন আপনজনকে আকুল হয়ে কাছে ডাকেন আর এমনি করে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চোখের জল ফেলেন।

স্বাহা আর কর্পূরমঞ্জরী দুজনেই ভট্টাচার্য মশায়ের মুগ্ধ শ্রোতা। তীক্ষ্ণধী কর্পূরমঞ্জরী শুনতে শুনতে কত শ্লোক কণ্ঠস্থ করে ফেলে। রামায়ণে সীতাবিসর্জন যেদিন পড়া হল, সেদিন ভট্টাচার্য মশায়কে আর কিছু খাওয়ান গেল না। সারাদিন শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন তিনি। চোখ বেয়ে অনর্গল ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

এ হেন মানুষেরও একদিন পরিবর্তন এল। স্বাহা অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছে এ সত্যটি যেদিন এক প্রতিবেশীর মুখ থেকে ভট্টাচার্য মশায় শুনলেন সেদিন থেকে হঠাৎ যেন তিনি ঘোরতর সংসারী হয়ে উঠলেন। পঠনপাঠন কোথায় রইল। মেয়েকে পাত্রস্থ করতে হবে এই চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসল। ঘটক আসতে লাগল সম্বন্ধ নিয়ে। ভট্টাচার্য মশায় ভঙ্গ। সেকালে কুলীনের ঘরে কন্যা দিতে পারলেই

ভঙ্গেরা বিশেষ মর্যাদা পেত। সরলপ্রাণ ভট্টাচার্য মশায় প্রতি-বেশীদের কথায় কুলীনের হাতে কন্যা সম্প্রদানের বাসনা করতে লাগলেন।

সেকালে কুলীন বৃদ্ধ হলেও তার মর্যাদা ছিল অপরিসীম। নৌকোযোগে তাঁরা পরিভ্রমণে বের হতো। যে ঘাটে নৌকো লাগত তার আশপাশের গ্রাম থেকে বিবাহযোগ্যা পাত্রীর অভিভাবকরা সন্ধান পেয়ে দলে দলে সেখানে এসে জড় হত। ভঙ্গেরা সামাজিক মর্যাদার লোভে বহু টাকা দিয়ে কুলীন বৃদ্ধের হাতে কন্যা সম্প্রদান করত। দরে দামে না বনলে বিবাহ হত না। অর্থের দিক থেকে যেগুলি কুলীন বৃদ্ধের মনোমত হত সেই গুলিকেই তিনি উদ্ধার করতেন। এক রাত্রিতেই হয়ত আট দশটি কন্যাকে বিবাহ বন্ধনে বেঁধে পর দিবস আবার যাত্রা করতেন। কন্যা অধিকাংশ সময়ে পিত্রালয়েই থেকে যেত।

এর পর বছরে বছরে নৌকো আসত। বৃদ্ধ জামাতা শারীরিক অসামর্থ্যের জন্যে প্রতি বছর আসতে পারতেন না। তবে তাঁর নিযুক্ত লোক এসে শ্বশুরালয় থেকে জামাতার প্রাপ্য সম্মান নিয়মিত নিয়ে যেত।

এমনি এক কুলীনের নৌকো একদিন ঘাটে এসে ভিড়ল। খবর পেয়ে ভট্টাচার্য মশায় প্রতিবেশীদের নিয়ে সেখানে হাজির হলেন। কিন্তু এ কি দৃশ্য তিনি দেখলেন! এক সামর্থ্যহীন বৃদ্ধ সেই নৌকোর যাত্রী। নাঃ, তিনি কিছুতেই প্রাণ ধরে স্বাহাকে এই লোকটার হাতে তুলে দিতে পারবেন না। মা-হারা মেয়ের দুর্ভাগ্য তিনি কেমন করেই বা চোখে দেখবেন। কিন্তু সংসারী মানুষেরা ভট্টাচার্য মশায়কে ঘিরে ধরলেন। অরক্ষণীয়া কন্যা ঘরে রয়েছে, পণ্ডিতের কি নরকেরও ভয় নেই? তাছাড়া পাত্রের বার্ধক্যের জন্য বরপণের দিক থেকেও বিশেষ সুবিধে রয়েছে। এমন সুবর্ণসুযোগ আহাম্মক ছাড়া কেউ কখনো ছেড়ে দেয়।

অগত্যা রাজী হতে হল ভট্টাচার্য মশায়কে।

শুভলগ্নে শাঁখ বাজল। শাঁখ বাজাতে গিয়ে কর্পূরমঞ্জরীর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। সে-জল আঁচলে মুছে আনুষ্ঠানিক কাজ করল সে। মনে মনে শুধু প্রার্থনা করল, ঠাকুর, স্বাহাকে এয়োতি রেখে মৃত্যু দাও।

বিয়ের আসরে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হল না। স্বাহাকে সম্প্রদান করতে গিয়ে ভট্টাচার্য মশায় চোখের জলে বুক ভাসালেন। বৃদ্ধের হাতে হাত রেখে স্বাহা বসে আছে। মনে হল যেন শুষ্ক মৃতপ্রায় গাছে একটি মাত্র কচিপাতা কেঁপে কেঁপে উঠছে!

বিয়ের পর আর একটি দিনও অপেক্ষা করা সম্ভব হল না পাত্রের।

কুলীন বৃদ্ধ তাঁর প্রাপ্য নিয়ে ভট্টাচার্য মশায়কে নরকের হাত থেকে উদ্ধার করে পরদিবসই রওনা দিলেন।

একটা দুঃস্বপ্নও সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল। জীবনযাত্রা যেমন চলছিল ঠিক তেমনি চলতে লাগল। যেন কোথাও কোন পরিবর্তন হয়নি। এক রাত্রির একটা নাটক অভিনয়ের পর আবার যে যার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে।

কিন্তু এ বিয়ের পর থেকে পরিবর্তন এল কর্পূরমঞ্জরীর। সহমরণকে অস্বীকার করে সে সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করবার সাহস সঞ্চয় করেছিল। এখন স্বাহার এই অস্বাভাবিক বিয়েতে হিন্দুসমাজের আর একটা বীভৎস রূপ তার চোখের সামনে ফুটে উঠল। সে কোনমতেই এ ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারল না। কিন্তু নিরুপায় সে। শুধু অক্ষম একটা আক্রোশ তার মনের মধ্যে গুমরে মরতে লাগল।

বিয়ের পর বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। স্বাহার সিঁথিতে লাল সিঁদুরের রেখা ছাড়া আর কোন দর্শনীয় পরিবর্তন ঘটেনি। তেমনি দুটি বোনের নিত্যকার কাজকর্ম আর হাসিগল্পের ভেতর দিন

কেটে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে নতুন জামাতা মুখুটি মশাইকে নিয়ে কর্পূরমঞ্জরী রঙ্গ করে।

বিয়ের রাতে বৃদ্ধের পান খাবার প্রবল ইচ্ছে হয়েছিল। জামাই এর ইচ্ছা পূরণের জন্যে পান এল। কিন্তু ফোকলা দাঁতে পান চিবুবে কি করে। এদিকে বৃদ্ধ যে তার সবক'টি দাঁতই খুইয়েছে সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না। শেষে প্রতিবেশিনীরা রঙ্গ করে বলতে লাগল, আহা নোড়াটা নিয়ে এলাম দাঁতের গোড়া ভাঙব বলে, তা নয়, তাই দিয়ে পান থেতো করতে হল।

বিয়ের রাতের এই প্রসঙ্গটি কর্পূরমঞ্জরী মাঝে মাঝে উত্থাপন করে। অমনি এই সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে হেসে লুটিয়ে পড়ে দুটি বোন। তারপর রঙ্গরসের মাঝে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় কর্পূরমঞ্জরী। স্বাহার দিকে তাকিয়ে থাকে কতক্ষণ। পলক পড়ে না চোখে। টস টস করে চোখ বেয়ে শুধু জল গড়িয়ে পড়ে। স্বাহা তার চোখের জল মুছে দেয়, জানতে চায় তার কান্নার কারণ, কিন্তু কোন উত্তরই মেলে না কর্পূরমঞ্জরীর কাছ থেকে। স্বাহার বিয়ের পর থেকে কর্পূরমঞ্জরী মাঝে মাঝে একটা বীভৎস স্বপ্ন দেখে। দাউ দাউ করে চিতা জ্বলছে। রাঙা পেড়ে শাড়ি পরে একটি মেয়ে সেই চিতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কর্পূরমঞ্জরী দেখতে পাচ্ছে না তার মুখ। চিতার কাছে গিয়েই মেয়েটি চীৎকার করে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। সবাই তার দিকে লাঠি সোটা নিয়ে তেড়ে চলেছে। একবার শুধু এক পলকের জন্যে মেয়েটি পেছন ফিরে দেখেছিল। কর্পূরমঞ্জরী তাতেই চিনতে পেরেছে, আর চিনতে পেরেই সে চীৎকার করে উঠেছে—স্বাহা, স্বাহা।

কি দিদি, স্বপ্ন দেখছ ? স্বাহা তার গায়ে নাড়া দিয়ে কতদিন এই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছে।

বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই স্বাহার ভেতর হঠাৎ কেমন একটা পরিবর্তন দেখা গেল। মাঝে মাঝে স্বাহা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

কর্পূরমঞ্জরী ডাক দিলে কেমন যেন সে চমকে ওঠে। ছুটি বোনের গল্পগুজব হাসিঠাট্টার আসর আর তেমন করে জমে না। কোথায় যেন একটা তাল কেটে গিয়ে ছন্দপতন হয়েছে। কর্পূরমঞ্জরী কারণ জানতে চাইলে স্বাহা ম্লান হেসে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায়। কর্পূরমঞ্জরী নিজের মনেই কারণ খুঁজতে থাকে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাগুলোকে টেনে এনে সে বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করে। কোন সামান্য কারণে সে আঘাত দিয়েছে কিনা তাই ভেবে ভেবে সারা হয়। কিন্তু কোন কারণ মেলে না, আর স্বাহার আকস্মিক মৌনতাও ভাঙে না।

কর্পূরমঞ্জরী দুঃখ পায়। মনে মনে ভাবে, এমন একটা ঝড়ো হাওয়া বয়ে আসে না যা স্বাহার মনের ভেতরে জমে-ওঠা এই গুমোট আবহাওয়াটাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে হাওয়ার আবির্ভাব ঘটল না। শুধু একটা কালো মেঘ দিনের পর দিন ঘনিয়ে উঠতে লাগল।

সেদিন দোল উৎসব। গৃহদেবতা রাধামাধবের মন্দিরে পূজার্চনা।

পুজোয় অনেক সময় কাটল। ঠাকুরের চরণে আবীর দিয়ে সকলে প্রণাম করল। তারপর একে অন্যকে যথারীতি আবীর দিলে। অনুষ্ঠান শেষ হতে একটু রাত্তির হল। সারাদিনের ক্লান্তির পর ঘুমিয়ে পড়ল সবাই।

রাত তখন কত ঠিক ঠাহর হয় না, ঘুম ভেঙে গেল কর্পূরমঞ্জরীর। হাত বাড়িয়ে দেখল স্বাহা বিছানায় নেই। ঘাটে গেছে ভেবে সে চুপ করে কিছুক্ষণ বিছানায় পড়ে রইল, কিন্তু চোখে ঘুম এল না তার। বেশ কিছু সময় কেটে গেল, স্বাহার দেখা নেই। উদ্বিগ্ন হল কর্পূরমঞ্জরী। বাইরের দরজা বন্ধ, সেদিকে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। কর্পূরমঞ্জরী খিড়কীর দিকেই গেল। দরজার আগল খোলা কিন্তু ভেজিয়ে রাখা হয়েছে। ঘাটে গেলে দরজা ভেজিয়ে রেখে যাবার কোন দরকারই ত পড়ে না। কর্পূরমঞ্জরী দরজা খুলে

পুকুরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কেউ কোথাও নেই। ঘুমন্ত গ্রাম। দূর থেকে দু' একটা কুকুরের ডাক কেবল ভেসে এল।

পূর্ণিমার চাঁদ উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছিল। চারদিক এত স্পষ্ট মনে হচ্ছিল যে ঘাটের কলমীর দামের ওপর একটা পতঙ্গকে ঘুরে ঘুরে নাচতে দেখা যাচ্ছিল।

পুকুরের উত্তর দিকে নানা রকম গাছের জটলা। তার মাঝ দিয়ে সরু একটা পথ। সেই পথ ধরে কিছুটা গিয়েই প্রান্তরে নামা যায়। প্রান্তরের শেষে নদী। কর্পূরমঞ্জরী পুকুরের উত্তর দিকের সরু পথটা ধরে এগুতে লাগল। স্থানটা আবছা আলো-আঁধারে ঢাকা। ঝিঁঝি ডাকছিল। কিছুটা পথ এগিয়েই থামল কর্পূরমঞ্জরী। কারা যেন কথা কইছে। পথটা বাঁক নিয়েছে যেখানে সেখানে এসে সে উঁকি দিয়ে দেখল। বনের ভেতর একটা বড় গাছ, তার তলাটা বেশ পরিষ্কার। সেখানে গাছের ফাঁকে যেটুকু আলো এসে পড়ছিল সেই আলোয় সে দেখতে পেল ধনপতি দাঁড়িয়ে আছে, আর স্বাহা বসে তার পায়ে আবীর মাখিয়ে দিচ্ছে। ঝিমঝিম করে উঠল কর্পূরমঞ্জরীর সারা শরীর। কোন রকমে নিজেকে ওদের কাছ থেকে লুকিয়ে সে ঘরে এসে ঢুকল।

সে রাতটা তার কাটল দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে। এক সময় স্বাহা ফিরে এল। পা টিপে টিপে ঘরের ভেতর ঢুকল। বিছানার কাছে এসে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে সে লক্ষ্য করল কর্পূরমঞ্জরীকে। তারপর ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল বিছানায়। কর্পূরমঞ্জরী সব বুঝল। শুনতে পেল স্বাহা ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। একসময় স্বাহা ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমুতে পারল না কর্পূরমঞ্জরী।

শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল। কত এলোমেলো চিন্তা একে একে ভিড় করে এল তার মনে। একসময় স্বাহার ওপর ঘৃণায় তার সারা মনটা বিষিয়ে উঠল। স্বাহা বিবাহিতা হয়েও ভ্রষ্টা। এতদিনে সে বুঝতে পারল স্বাহা কেন ধনপতির স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বিশেষ

নজর দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চিন্তা এল তার মনে, স্বাহা বিমর্ষ হয়ে থাকে কেন? তবে কি স্বাহা—নাঃ, আর ভাবতে পারে না কর্পূরমঞ্জরী সেকথা।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার একধরনের চিন্তা ধীরে ধীরে তার মনে জেগে উঠতে লাগল। প্রতিটি মানুষের দেহের একটা ক্ষুধা আছে। কিন্তু সমাজ সে-ক্ষুধার পথ বাইরে থেকে অনেক সময় বন্ধ করে দেয়। তখন নিরুপায় হয়েই মানুষ নিষিদ্ধ পথে যাতায়াত শুরু করে। এ অপরাধ আসলে যাদের তারা কোন শাঁস্তি পায় না।

পূর্ণযৌবনা স্বাহার ছবিটা কর্পূরমঞ্জরীর চোখের ওপর ভেসে উঠল। আর একটা অথর্ব বৃদ্ধের ছবিও সে তার পাশে এনে দাঁড় করাল। কি বীভৎস এই মিলন! কর্পূরমঞ্জরীর চোখ বেয়ে প্লাবন নামল। চোখের জলে তার বুক ভেসে গেল। শান্ত যখন সে হল, তখন স্বাহার ওপর তার মনের ঘনিয়ে-ওঠা আগুন কখন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। শেষরাতে জানালার ফাঁক দিয়ে চাঁদের একফালি আলো এসে পড়েছিল। সেই আলোয় সে দেখল স্বাহার মুখ। ঘুমিয়ে আছে স্বাহা। মুখে চোখে কেমন একটা ক্লান্তি আর বেদনার ছাপ। কর্পূরমঞ্জরীর মনে হল স্বাহা বড় অসহায়। তার চেয়েও দুঃখী ব'লে মনে হল তাকে। গভীর আবেগে সে ঘুমন্ত স্বাহাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

ঘুম ভেঙ্গে স্বাহার অবাক হবার পালা। কর্পূরমঞ্জরী যে তাকে ভালবাসে, এ তার অজানা নয়। কিন্তু কর্পূরমঞ্জরীকে কোনদিন এমন করে কাছে আসতে সে দেখেনি। তাই প্রথমটা কেমন যেন বিস্মিত হল। কিন্তু একটু পরেই সে যখন বুঝতে পারল কর্পূরমঞ্জরীর চোখের জল তার বুকে এসে লাগছে তখন সেও জড়িয়ে ধরল কর্পূরমঞ্জরীকে। স্বাহা কোন কারণ না জেনেই কাঁদল। একটি চোখের জল অনেক সময় আর একটি চোখের জল টেনে আনে। কান্নায় সব সময় কারণের দরকার হয় না।

দুই বোনে কাঁদল কতক্ষণ দু'জনকে জড়িয়ে। কেঁদে কেঁদে হাল্‌কা হল পরস্পর। স্বাহার চোখের জল মুছে দিল কর্পূরমঞ্জরী। সে যে স্বাহাকে এত ভালবাসে, তা যেন আজ নতুন করে অনুভব করল।

সারা সকাল দু'জনে প্রসন্নমনে কাজ করল। ধারাবর্ষণের পর মাটির গুমোট ভাবটা যেমন কেটে যায়, তেমনি গত রাতের কান্নার পর পরস্পরের মনটা অনেক সহজ আর শান্ত হয়ে গেল।

দুপুরের দিকে ভট্টাচার্য মশায় বাইরের ঘরে বসে ছাত্রদের পড়াচ্ছিলেন, কর্পূরমঞ্জরী স্বাহাকে ডেকে বলল, চল চাঁপা, আমরা একটু ঘুরে আসি। বাবা পড়ার কাজে ডুবে গিয়েছেন, এখন আর সহজে উঠছেন না।

স্বাহা বলল, আমিও তাই ভাবছিলাম দিদি, কতদিন ঘরের বার হইনি। আজ চল দু'বোনে বেড়িয়ে আসা যাক।

দুটি বোন বেরুল খিড়কীর পথ দিয়ে। কর্পূরমঞ্জরী বলল, চল্‌ যাই নদীর ঘাটের দিকে। স্বাহা মাথা নেড়ে তাকে সমর্থন করল। পুকুর ঘুরে উত্তরের সেই সরু পথটা ধরে তারা এগুতে লাগল। কর্পূরমঞ্জরী আগে আগে চলল, স্বাহা রইল তার পেছনে। জংলা পথটা বড় সুন্দর। দুধারে বাঁশবন। মাঝে মাঝে আমের গাছ। বোল এসেছে এবার ডাল ভেঙে। একটা জলপাইয়ের গাছে ধূসর রঙের একটা ঘুঘু একটানা ঘু-ঘু-ঘু-ঘু ডেকে যাচ্ছে। সেই করুণস্বরে সারা দুপুরটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। কর্পূরমঞ্জরী গতরাতের সেই গাছটার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। বিরাট বকুলগাছ। পাতায় আর ফুলে ফলে ডাল দেখা যায় না। গাছের তলাটা কে যেন ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করে রেখে গেছে। কর্পূরমঞ্জরীকে সেখানে থামতে দেখে স্বাহা বলল, দাঁড়ালে কেন দিদি, নদীর ঘাটে যাবে না ?

এই বকুলতলাটা বড় সুন্দর, না রে ? আয় না আমরা এর তলায় বসি। কর্পূরমঞ্জরী স্বাহার হাত ধরে গাছের তলায় গিয়ে

বসল। কতদিন পরে কর্পূরমঞ্জরী যেন বালিকা হয়ে গেল। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, দেখ দেখ স্বাহা কত ফুল পড়েছে! কি মিষ্টি গন্ধ!

দুজনে মিলে ফুল কুড়াল। তারপর কাপড়ের আঁচল থেকে সুতো বের করে তাই দিয়ে মালা গাঁথল। সামনে খানিকটা রাঙা আবীর পড়েছিল। স্বাহা হঠাৎ বলে বসল, দেখ দিদি, কে এখানে আবীর ছড়িয়ে গেছে।

মনে মনে হাসল কর্পূরমঞ্জরী। মুখে বলল, নিশ্চয়ই কেউ এখানে তার মনের মানুষকে আবীর দিয়েছে।

চমকে উঠল স্বাহা। মুখখানা ম্লান হয়ে গেল তার। এই একটি কথায় যেন তার এতকালের গোপনতা খান খান হয়ে ভেঙে গেল। সে মাথা নীচু করে অপরাধীর মত ফুলে সুতো পরাতে লাগল। কিন্তু তখন তার সারা শরীর কাঁপছিল, তাই একটিও ফুল আর সে সুতোয় গাঁথতে পারল না।

কর্পূরমঞ্জরী হঠাৎ মালাগাঁথা বন্ধ করে স্বাহার নত মুখখানাকে তুলে ধরল। একটি কোমল মুখ তার ভীরু দুটি চোখের পাতা কাঁপিয়ে সহসা স্থির হয়ে গেল।

ধনপতিকে তোর খুব ভাল লাগে, না রে? কর্পূরমঞ্জরীর স্বরে মমতা মাখানো। স্বাহার স্থির দুটি চোখ থেকে সহসা টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল। যেন কয়েকটা বকুলফুল গাছ থেকে ঝরে পড়ল মাটিতে।

তারপর কতক্ষণ আর কোন কথা হল না দু'জনের। স্বাহা দিদির বুকে সেই যে মুখ লুকাল আর তুলল না।

এক সময় কর্পূরমঞ্জরী স্বাহার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, কেন বলিসনি আমায় আগে? কেন তুই এমন পর ভাবলি স্বাহা?

কর্পূরমঞ্জরীর কথার উত্তরে স্বাহা শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, কোন উত্তর দিল না। কর্পূরমঞ্জরী বলল, আগেই কেমন

সন্দেহ হয়েছিল তোর অবস্থা দেখে। কিন্তু তখনও আমার কাছে কিছু পরিষ্কার হয়নি। মুখুজ্জে মশায় সেই কবে বিয়ের পর চলে গেছেন, প্রায় বছর ঘুরে আসতে চলল। কিন্তু এসময় শরীরের এ অবস্থা কি করে সম্ভব হতে পারে। সে প্রশ্নের উত্তর মিলল কাল রাতে এই বকুলগাছের তলায় তোদের দুজনকে দেখে।

স্বাহা এতক্ষণে মুখ তুলল। মুখখানা তার রক্তশূন্য হয়ে গেছে।

কি হবে আমার দিদি! অসহায়ের মত তাকিয়ে রইল স্বাহা।

তোর এ অবস্থার কথা জানে ধনপতি?

স্বাহা মাথা নেড়ে জানাল যে ধনপতিকে এ কথা সে জানায়নি।

তোকে এখান থেকে নিয়ে চলে যেতে পারবে ধনপতি? তুই তাকে এ-কথা জিজ্ঞেস করেছিস?

স্বাহা এবারও মাথা নেড়ে জানাল যে ধনপতিকে এ-সকল কথা সে জিজ্ঞেস করেনি।

কর্পূরমঞ্জরী বলল, এখন দুটো পথ খোলা আছে। হয় জন্মের মত এ ঘর ছেড়ে ধনপতির সঙ্গে চলে যা, যেদিকে দু চোখ যায়। নয়ত ধনপতিকে একেবারে ত্যাগ কর। অবশ্য ধনপতিকে ছেড়ে দিলেও সমস্যা একেবারে মিটবে না। তার জন্যে নতুন করে পথ খুঁজে বের করতে হবে।

এরপর সেই বকুলতলায় দু'বোনের অনেক পরামর্শ হল। কর্পূরমঞ্জরীর কথা মত ঘরে ফিরে স্বাহা ধনপতিকে সব কথা জানাল। স্বাহাকে নিয়ে গৃহত্যাগ করতে হবে শুনে ধনপতি চমকে উঠল। পরের দিন দেখা গেল ধনপতি সবার অলক্ষ্যে গুরুগৃহ ত্যাগ করে চোরের মত একাই কোথায় পলিয়ে গেছে।

ধনপতির কাপুরুষতায় স্বাহার মন ঘৃণায় ভরে গেল। এই নীচ লোভী মানুষটাকে সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে—একথা ভাবতে গিয়েও শিউরে উঠল তার সারাটা শরীর।

কিন্তু এখন উপায়? অবাঞ্ছিত সন্তানের জননী হতে

চলেছে সে। বিবাহিতা হয়েও ঘটনাচক্রে মা হবার অধিকার নেই তার।

সে সমস্যারও সমাধান করল কর্পূরমঞ্জরী।

ভট্টাচার্য মশায়ের কাছে নতুন জামাতাকে আনবার প্রস্তাব আনল সে। স্বাহা মনমরা হয়ে থাকে, এবং তা যে কেবল মুখুজ্জে মশায়ের জন্য একথা কর্পূরমঞ্জরী ফলাও করে জানাতে ভুলল না।

চিঠি গেল নতুন জামাই-এর কাছে। শুধু চিঠিতে জামাই-এর মন ভিজবে না, তাই অতিরিক্ত দক্ষিণার আভাসও দেওয়া হল সেই সঙ্গে।

ফল ফলতে বিলম্ব হল না। ঘাটে এসে একদিন ভিড়ল মুখুজ্জে মশায়ের নৌকো।

যথারীতি ভট্টাচার্য মশায় জামাতাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন, কিন্তু জামাই একরাতের বেশী থাকতে রাজী নয়।

কর্পূরমঞ্জরী তাতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। এত উদ্যোগ, আয়োজন নিস্ফল হল দেখে ভট্টাচার্য মশায় ক্ষুণ্ন হলেন।

বিদায়ের সময় জামাতাকে দক্ষিণা দিলেন। পরে দুটি হাত ধরে বললেন, বাবা, মেয়ে আমার সারাদিন মনমরা হয়ে থাকে, সতীর পতিই একমাত্র গতি, মা-হারা মেয়েটিকে যদি দয়া করে গৃহে স্থান দেন তাহলে ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।

মুখুজ্জে মশায় উত্তরে বললেন, বিবেচনা করে দেখুন আমরা কুলীনের ঘরের ছেলে। অরক্ষণীয়া কন্যাদের উদ্ধার করাই হল আমাদের কাজ। সেদিক থেকে বিবেচনা করে দেখুন আমি বিংশতিটি দারপরিগ্রহ করেছি। এ অবস্থায় ঘরে যদি চারটি করেও সহধর্মিণীকে বৎসরকাল সেবার সুযোগ দিই, তাহলে পালাক্রমে পাঁচ বৎসর কাল পরে আপনার কন্যাকে স্থান দিতে পারি। বিবেচনা করে দেখুন, কুলীনের সন্তান, পক্ষপাতিত্বহেতু অধর্মাচরণ ত করতে পারিনে।

শেষে বৎসরান্তে দেহ পটু থাকলে একবার করে দর্শন দিয়ে যাবার আশ্বাস দিয়ে ভট্টাচার্য মশায়ের জামাতা নৌকারোহণ করলেন।

স্বাহা যথাকালে একটি কন্যার জননী হল। ভট্টাচার্য মশায় আনন্দে আকুল হলেন। জামাতার কাছে শুভ-সংবাদ বহন করে পত্র গেল। মুখুজ্জে মশায় গণনা করে দেখলেন মেয়েটি আটাশে হয়েছে। তিনি খাতার পাতায় লিখলেন, বিলাসপুরনিবাসিনঃ ভট্টাচার্য মহাশয়স্য দুহিতায়াঃ শুভকন্যা জাতা। এরপর পাঁচবছর অপেক্ষা করতে হল না স্বাহাকে। কন্যাটি যখন তিন বছরে পড়ল একদিন হঠাৎ ডাক এল স্বাহার শ্বশুরবাড়ী থেকে। মুখুজ্জে মশায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তিনি সহধর্মিণীদের একসঙ্গে দেখতে চান।

এ অবস্থায় সতী কন্যাদের পতিসেবার সুযোগ নিতে হয়।

স্বাহাকেও প্রতিবেশীরা পীড়াপীড়ি করে সকন্যা শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিল। বিদায়কালে ভট্টাচার্য মশায় চোখের জল মুছে বললেন, সাবিত্রী সমান হও মা। পতিই তোমার একমাত্র গতি বলে জেনো। আমার জন্যে ভেবো না মা। রাধামাধব তাঁর এ অক্ষম সন্তানকে দেখবেন।

স্বাহা গেল শ্বশুরবাড়ী। কয়েকদিন যেতে না যেতেই খবর এল মুখুজ্জে মশায়ের অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকেই চলেছে। কর্পূরমঞ্জরী অস্থির হয়ে উঠল। রাতগুলো তার অসহ্য এক দুঃস্বপ্নে কাটতে লাগল। ভট্টাচার্য মশায় রাধামাধবের কাছে জামাতার নিরাময় কামনা করতে লাগলেন।

শেষে কর্পূরমঞ্জরী ভট্টাচার্য মশায়কে বলল, বাবা, স্বাহা আজ একা একা দুঃখ ভোগ করছে, যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি এ সময়ে তার কাছে গিয়ে থাকি।

কর্পূরমঞ্জরীর কথায় ভট্টাচার্য মশায় মনে মনে কিছুটা শান্তি পেলেন। তিনি কর্পূরমঞ্জরীকে স্বাহার শ্বশুরালয়ে যাবার অনুমতি দিয়ে নিশ্চিন্ততা অনুভব করলেন।

কর্পূরমঞ্জরী এক সন্ধ্যায় নৌকা যোগে গিয়ে পৌঁছল স্বাহার শ্বশুরবাড়ী। কিন্তু তখন মুখুজ্জে মশায়ের অন্তর্জলির কাজ নিষ্পন্ন হয়ে গেছে। কর্পূরমঞ্জরীকে কাছে পেয়ে তার বুকে আছড়ে পড়ল স্বাহা। অসহায় মেয়েটাও মাকে অমন করতে দেখে কেঁদে আকুল হল।

সন্ধ্যায় মুখুজ্জে মশায়ের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটল। গ্রাম ভেঙে লোক জড় হল মুখুজ্জে মশায়ের গৃহে। এতবড় কুলীন এ তল্লাটে কেউ নেই। তাছাড়া মুখুজ্জে মশায় বিশেষ সংগতিপন্ন। সুতরাং সমারোহ সহকারে তাঁর সৎকারের ব্যবস্থা চলল। ত্রয়োদশ সহধর্মিণী উপস্থিত রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একটি রয়েছেন গর্ভিণী সুতরাং শাস্ত্রোক্ত বিধিমতে তিনি সহমরণের অনুপযুক্তা। অন্য দ্বাদশজনকে সহমৃতা হতে হবে। এতবড় একটা আয়োজন ইতিপূর্বে এখানে আর হয়নি। তাই চারদিকে প্রবল চঞ্চল্য আর উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। সতীদাহের বিরাট সমারোহের কথাটা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। ঢ্যাঁড়া বাদকেরা রাত্রিযোগে গ্রাম গ্রামান্তে দৌড়ল এই খবরটা ঘোষণা করে দেবার জন্য।

গ্রামের মাতব্বরেরা মহৎকার্য কিভাবে সুসম্পন্ন হবে তাই নিয়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। দীর্ঘরাত্রি বাদপ্রতিবাদের পর স্থির হল, একটি দাহকুণ্ড খনন করা হবে, এবং সেই কুণ্ডের মধ্যেই চিতা রচনা করে দাহক্রিয়া নিষ্পন্ন করতে হবে। প্রতিবারে তিনটি করে ভার্যা চিতায় প্রবেশ করতে থাকলে চার বারেই কার্য নিষ্পন্ন হয়ে যাবে। তারপর কথা উঠল মুখুজ্জে মশায়ের অবশিষ্ট পত্নীদের সম্বন্ধে, যাঁরা দুর্ভাগ্যক্রমে সহমৃতা হতে পারলেন না। এই প্রসঙ্গ নিয়ে ব্রাহ্মণেরা দুইদলে বিভক্ত হয়ে ঘোরতর কোলাহলের সৃষ্টি করলেন। একদল বললেন, ব্রাহ্মণ বংশজাতার পক্ষে অনুমরণ অসিদ্ধ। কেবল সহমরণেই তাদের অধিকার। ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর নারীগণ কোনকারণে স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হতে না পারলে তাদের

ক্ষেত্রেই কেবল অনুমরণ শাস্ত্রসম্মত। সেক্ষেত্রে তারা স্বামীর পাদুকাদি প্রিয়বস্তু বক্ষে ধারণ করে পৃথক চিতায় প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু 'পৃথক্‌চিতিং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি।' অতএব শাস্ত্রোক্তবিধি অলঙ্ঘনীয়। বিরুদ্ধবাদীরা বললেন, দেশকাল অনুযায়ী শাস্ত্রবিধিরও ব্যতিক্রম হয়।

তাঁরা মহর্ষি অঙ্গিরার উক্তি থেকে তাঁদের সমর্থনে যুক্তি দেখাতে লাগলেন। কিন্তু শেষে গ্রামের মাতব্বরেরা অনুপস্থিত ভার্যাদের চিতারোহণের পরম সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করলেন। স্বচক্ষে তাঁরা যাঁদের দাহক্রিয়া দেখতে পাবেন না, তাঁদের সে সুযোগ দান করবেন এতখানি অবিবেচক তাঁরা হতে পারেন না।

দাহকুণ্ডে কাঠ যোগাতে হবে, সে জন্যে শত শত কুঠারের শব্দে দিক্ বিদিক্ শব্দিত হতে লাগল। রাতের অন্ধকারে সে ভয়াবহ শব্দ বহু দূর-দূরান্তের গ্রামে গ্রামে প্রবল বিভীষিকার সৃষ্টি করল। সারা রাত্রি ধরে চলল উদ্যোগ আয়োজন। ক্ষণে ক্ষণে ধর্মরাজের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কম্পিত হতে লাগল।

জাতিধর্ম নির্বিশেষে গ্রাম গ্রামান্ত থেকে সধবা রমণীকুল দলে দলে এই পুণ্য দাহক্রিয়া দেখতে ভিড় করে এল। প্রভাতের আকাশে অগ্নিশ্বর বিভাবসু উদিত হলেন। ঘোর রবে ঢাক ঢোল শঙ্খ ঘণ্টাদি বাজতে লাগল। দাহের সমস্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত। ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন। মুখুজ্জেমশায়ের পুত্রেরা সম্পন্ন করল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি।

প্রবল সন্ত্রাসে মুখুজ্জে-ভার্যাদের কেটেছে সারারাত, জ্বলন্ত চিতায় পুড়ে মরার ভয়ে কেউ কেউ ঘন ঘন মূর্ছিত হয়ে পড়ছেন। মুখুজ্জের কোন কোন ভার্যা হা হা করে অট্টহাসি হাসছেন। একটা প্রবল ভয়ে উন্মাদ হয়ে গেছেন তাঁরা। কেউ বা টেনে ছিঁড়ছেন মাথার চুল। সারারাত প্রবল জয়ধ্বনি আর বিলাপধ্বনিতে মিলে একটা নারকীয় দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্বাহা জড়িয়ে বসে আছে কর্পূরমঞ্জরীকে। যেন আত্মরক্ষার একটা অবলম্বন পেয়েছে সে। আজ দুজনে দুজনকে জড়িয়ে আছে নিবিড় বাঁধনে। মেয়েটা কেঁদে কেঁদে কখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কর্পূরমঞ্জরী একবার ভেবেছিল স্বাহাকে নিয়ে পালাবার কথা। কিন্তু সমস্ত দ্বারেই লোক নিযুক্ত হয়ে আছে। সে দুরাশা সে ত্যাগ করেছে বহুক্ষণ। কঠিন পাষাণ হয়ে গেছে সে। বোধকরি এখন চেষ্টা করলেও সে এক পা উঠে যেতে পারবে না। কোন এক মোহিনী যাদুকরী যেন তার সব শক্তিটুকু নিঃশেষে টেনে নিয়ে তাকে মোহাবিষ্ট করে বেঁধে রেখেছে।

সে অনুভব করল স্বাহা মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে। থর থর করে তার সারা শরীটায় প্রবল এক তরঙ্গ খেলে বেড়াচ্ছে।

শেষরাতে স্বাহা বলল, দিদি ধনপতিকে বড় ভাল বাসতাম আমি, আজ তার মুখটা কেবলই ভেসে ভেসে উঠছে।

কর্পূরমঞ্জরী এ কথার কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। সে শুধু স্বাহার মুখের দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে রইল। স্বাহা আপনমনেই যেন বলে যেতে লাগল, ও পালিয়ে গেল তাই ঘৃণা করেছি কিন্তু তাকে ভুলতে পারলাম কই! ও নেই কিন্তু রেখে গেছে ওর সন্তানকে। ওকে কেমন করে ভোলা যায়।

কর্পূরমঞ্জরী বলল, আজ সে ভাবনা থাক বোন। তোমার সব ভাবনা এখন রাধামাধবকে নিবেদন করে নিশ্চিন্ত হও।

মৃদু হাসি ফুটে উঠল স্বাহার মুখে, যাবার আগে দুটো কথা বলতে দেবে না দিদি। আর কোনদিন তোমাদের কাছে কথা বলতে ত ফিরে আসব না।

কর্পূরমঞ্জরী স্বাহাকে আরও নিবিড় করে চেপে ধরল বুকের ওপর।

স্বাহা বলে চলল, আমি আমার প্রাণমন দিয়ে যাকে একটি দিনের জন্যও মেনে নিতে পারলাম না, সমাজ তাকেই শুকনো দুটো

মন্তর পড়ে আমার মনের মালিক করে বসিয়ে দিলে! সত্যি দিদি আজ চলে যাবার সময়ে বড় হাসি পাচ্ছে সমাজের এইসব কীর্তির কথা ভেবে। ধনপতি বামুন ছিল না ঠিক, কিন্তু সে একটি মেয়েকে ভালবেসেছিল, আর সে মেয়েটিও তাকে তার সবটুকু প্রাণমন সঁপে দিয়েছিল।

আজ তাই শেষ বেলা মনে হচ্ছে ধনপতি আমাকে ছেড়ে চলে গেলেও সে আমার স্বামী। সে অব্রাহ্মণ হলেও আমার ওপর তার সবচেয়ে বড় অধিকার। আমি তার মেয়ের মা। ধনপতি পালাতে পারেনি দিদি, সে মেয়ের ভেতর দিয়ে আমার কাছে বাঁধা পড়ে গেছে।

কিছুক্ষণ থামল স্বাহা। তারপর একসময় বলল, আচ্ছা দিদি আমাদের সমাজের মোড়ল পণ্ডিতগুলো কি বোকা। মরলে যে দেহটা শুধু শেয়াল কুকুরের খাদ্য হয় সেই দেহটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে ওদের কি লোভ! আমার মন রইল একজনের কাছে পড়ে আর আমি দেহটা আগুনে পুড়িয়ে সতীসাধ্বী হয়ে গেলাম।

কথা বলতে বলতে একসময় থেমে গেল স্বাহা। আবার ভাবান্তর হল। বলল, এসব কথা এখন মনে করা পাপ, না দিদি?

কর্পূরমঞ্জরী স্বাহাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কোন পাপই তোকে স্পর্শ করতে পারবে না বোন। মিথ্যে শাস্ত্রের শাসনে যে মনকে বাঁধা যায় না, একথা মানুষ একদিন বুঝবে। সেদিন আর তোর আমার মত অসহায় মেয়েদের এমন করে সমাজের কাছে বলী হতে হবে না।

স্বাহা যেন কর্পূরমঞ্জরীর মুখে আলো দেখতে পেল। সে দিদিকে জড়িয়ে বলল, দিদি আমি ত চললাম, কিন্তু তুমি রইলে। আজ তুমি যদি আমাকে কথা দাও যে মানুষের সমাজে যারা অসহায় হয়ে পুড়ে মরছে তাদের হয়ে তুমি ভাববে, তাদের

পাশে তুমি দাঁড়াবে, তাহলে আমি আগুনের জ্বালাও হাসিমুখে সইব দিদি।

আজ স্বাহা কি কথা শোনাল কর্পূরমঞ্জরীকে। জীবনের কি এক দুঃসাধ্য ব্রত সাধনের ভার দিয়ে গেল তার ওপর। কেমন করে সে এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলবে। কোথায় শুরু হবে, শেষও বা হবে কোথায়। সবই আজ ঘন আঁধারে ঢাকা।

তবু স্বাহাকে কথা দেবে কর্পূরমঞ্জরী। যে মৃত্যুর হাত থেকে সে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়েছে সেই মৃত্যুর মুখ থেকে সে তার সাধ্যমত টেনে তুলবার চেষ্টা করবে অন্যকেও।

কর্পূরমঞ্জরী স্বাহার কথার উত্তরে শুধু মাথা নাড়ল। আর কিছু বলার দরকার ছিল না। পরম নিশ্চিন্তে স্বাহা শেষরাতটুকু কর্পূরমঞ্জরীর কোলেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশিনীরা মুখুজ্জের ভার্যাদের স্নানাদি অনুষ্ঠানের জন্য টেনে টেনে তুলতে লাগল। আবার শুরু হল আর্ত কোলাহল। কর্পূরমঞ্জরীর কাছে এসে স্বাহাকেও তারা তেমনি করে টেনে তুলল। কর্পূরমঞ্জরী তাকাল স্বাহার দিকে। রুক্ষ চুলের রাশ ঢেকে ফেলেছে স্বাহার মুখ। তার ভেতর দিয়ে স্বাহা তাকিয়ে আছে। হাহাকার করে উঠল কর্পূরমঞ্জরী। স্বাহার ঘুমন্ত মেয়েটাকে বুকে টেনে জড়িয়ে ধরল সে। চোখ বেয়ে জলের ধারা অবিরল বয়ে চলল।

দাহস্থান ইতিমধ্যেই লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। গ্রামের যুবকেরা কোমরে গামছা বেঁধে জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অগণিত মহিলা ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি করে যাচ্ছে। ধর্মরাজের আর সতীদের জয়ধ্বনি উঠছে ক্ষণে ক্ষণে।

এবার স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধান করে মুখুজ্জের দ্বাদশ ভার্যা দাহস্থানে প্রবেশ করলেন। মূর্ছিতাদের বহন করে নিয়ে আসা হল। প্রবল হুড়োহুড়ি সৃষ্টি হল এবার। সবাই দেখতে চায়

সতীদের। দর্শনার্থী রমণীদের দেখে কারু বা চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

নদীতীরের শ্মশানে দাহের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। সেইখানেই খনন করা হয়েছিল দাহকুণ্ড। রাত থেকেই নদীর তীর দর্শনার্থী নরনারীতে ছেয়ে গিয়েছিল। নৌকোতে দূর দূর গ্রাম থেকে আসছিল নরনারীর দল।

শ্মশানঘাটের নদীতে নৌকোর ভিড় জমে গেল।

পুরোহিতেরা মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন ঃ

'মৃতে ভর্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সারুন্ধতী সমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
তিস্রঃ কোট্যর্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবন্ত্যব্দানি তা স্বর্গে ভর্তারং যানুগচ্ছতি॥'

জনৈক ব্রাহ্মণ সমবেত রমণীদের লক্ষ্য করে শ্লোকটির ব্যাখ্যা করলেন, যে নারী মৃত পতির সঙ্গে একযোগে অগ্নিতে প্রবেশ করেন, তিনি অরুন্ধতীর তুল্য আচরণ করে স্বর্গে গমন করেন। যে রমণী এইভাবে স্বামীর অনুগমন করেন তিনি সাড়ে তিনকোটী এবং মনুষ্যদেহে যত লোম আছে তত বৎসর স্বর্গে বসতি করেন।

এই পবিত্র বাণী উচ্চারণের পর আবার শঙ্খধ্বনি ও ধর্মরাজের জয়ধ্বনি উঠল। সমবেত সাধ্বীকুল মৃত্যুর দেবতার উদ্দেশ্যে বার বার নমস্কার জানাতে লাগল। দর্শকদের মাঝে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে নির্বাক নিস্পন্দ শুধু দাঁড়িয়েছিল একজন, সে প্রস্তর কি মানবী তা বোঝা গেল না। স্থিরদৃষ্টিতে সে শুধু তাকিয়েছিল দাহকুণ্ডের দিকে।

মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে চিতায় শবদেহ তোলা হল। মুখুজ্জে মশায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র মুখাগ্নি করল কুণ্ডের ভেতর নেমে গিয়ে। এরপর ঘৃতাদি সহযোগে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল চিতা। প্রথমে আনা হল গঙ্গামণি, দুর্গাবতী, হরসুন্দরী আর গিরিবাসিনীকে।

এঁরা কুশ হাতে নিয়ে পূর্বমুখী হয়ে উপবেশন করলেন। এরপর শুরু হল সংকল্প পাঠ। ব্রাহ্মণগণ 'ওঁ তৎ সৎ' 'ওঁ তৎ সৎ' উচ্চারণ করতে লাগলেন।

চারজন ব্রাহ্মণ একসঙ্গে মুখুজ্জের চার স্ত্রীকে সংকল্প বাক্য পাঠ করালেন। প্রথমা গঙ্গামণির কণ্ঠ শোনা গেল, 'নমোহুদ্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং তিথৌ ভরদ্বাজগোত্রা শ্রীমতী গঙ্গামণি দেবী অরুন্ধতী সমাচারত্ব পূর্বক স্বর্গলোক মহীয়মানত্বমানবাধিকরণক লোম সমসংখ্যাব্দাবচ্ছিন্ন স্বর্গবাস ভর্তৃসহিত মোদমানত্ব মাতৃপিতৃ শ্বশুর-কলত্রয়পূতত্ব চতুর্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্ন কালাধিকরণ কাপ্সরোগণস্তুয়মানত্ব পতিসহিত ক্রীড়মানত্ব ব্রহ্মাঘ্ন পতিপূতত্বকামা ভর্তৃজ্বলচ্চিতারোহণমহং করিষ্যে।'

এই মন্ত্রে চারজনের সংকল্প পাঠ শেষ হল। ব্রাহ্মণগণের কণ্ঠস্বরই প্রবলভাবে শ্রুত হল। তারপর একে একে অষ্ট লোকপাল, আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, যম, ধর্ম ও হৃদয়মধ্যস্থ অন্তর্যামী পুরুষকে সাক্ষী রাখলেন রমণীগণ। এবার তাঁরা দাহকুণ্ডের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করলেন।

ব্রাহ্মণগণ সমস্বরে উচ্চারণ করে চললেন,

'ও ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু। অনশ্রবো অনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্ত জনয়ো যোনিমগ্নে।'

'ও ইমাঃ পতিব্রতাঃ পুণ্যাঃ স্ত্রিয়ো যা যাঃ, সুশোভনাঃ সহভর্তৃশরীরেণ সংবিশন্তু বিভাবসুং।'

তিনবার দাহকুণ্ড প্রদক্ষিণ করার পর স্থির হয়ে চারজন স্ত্রী দাঁড়ালেন। একই সঙ্গে পুরোহিত ওঁদের মন্ত্র পাঠ করালেন,

'ইহত্বা অগ্নে নমসা বিধেয় স্ত্ববর্গস্য লোকস্য সমেত্যৈ। জুষাণো অদ্য হবিষা জাতবেদো বিশানি ত্বা সত্যতো নয় মা পত্যুরগ্রে'।

হে অগ্নি, এই ব্রতে আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে জাতবেদ! তোমার কৃপায় আমি অদ্যই যেন স্বর্গে পৌঁছিতে পারি। হে অগ্নি!

মৎপ্রদত্ত ঘৃতসংযুক্ত আহুতি গ্রহণ করে আমাকে সাহস দাও। আমি যেন সহমৃতা হয়ে স্বামীসদনে যেতে পারি।

চার স্ত্রী চিতার অগ্নিতে স্বর্ণকণা ও ঘৃতাহুতি দান করলেন।

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। ব্রাহ্মণদের ইঙ্গিতে ভীমরবে ঢাক ঢোল কাঁসরাদি বেজে উঠল। শঙ্খের ধ্বনি আর জয়ধ্বনির মাঝে ভীতা রমণীদের আর্ত চীৎকার কোথায় ডুবে গেল। তাঁদের একে একে ঠেলে দেওয়া হল মরণকুণ্ডের মাঝে। দ্বিগুণ তেজে আগুনের শিখা উর্ধ্বমুখী হল। যেন কোন দানবের একটা ক্ষুধার্ত জিহ্বা লক্‌লক্‌ করে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

এমনি সারাদিন ধরে চলল দাহলীলা। মৃতের বীভৎস দাহগন্ধ বাতাসে বহুদূর ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

যাঁরা ইতিমধ্যেই মূর্ছিতা হয়ে পড়েছিলেন, বলিষ্ঠ যুবকেরা এসে তাঁদের বয়ে নিয়ে গেল। পুরোহিত তাঁদের হয়ে মন্ত্রপাঠ করলেন। অমনি অগ্নিকুণ্ডে প্রবল জয়ধ্বনির মধ্যে তাঁরা নিক্ষিপ্ত হলেন। কয়েকজন প্রাণভয়ে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের জনতা ধরে ফেলল। মুখুজ্জের ছেলেরা অনেক বুঝাল তাঁদের। এমনি করে পালালে চিতিভ্রষ্টার কলঙ্ক রটবে। মাতৃকুল, পিতৃকুল আর শ্বশুরকুলের সর্বনাশ ঘটবে। এ অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে অসতী হলে লোকনিন্দায় দেশ ছেয়ে যাবে। কিন্তু প্রাণের মায়া সবার বড়। ছেলের কাছে করজোড়ে জীবন ভিক্ষা করতে লাগলেন জননী। শেষে সকলে সমবেত হয়ে তাঁদের সবলে টেনে নিয়ে গিয়ে চিতাকুণ্ডে ফেলে দিয়ে এল। অমনি একটা প্রবল পৈশাচিক উল্লাস ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। যারা প্রথমে সতীদাহের দৃশ্য দেখে চোখে হাত দিয়ে হায় হায় করেছিল, তারাই এখন একটু বিলম্ব হলে মস্ত চীৎকার জুড়ে দিল। চারদিকের জনতা তখন প্রায় উন্মত্ত হয়ে গেছে। সহস্র চক্ষু যেন সহস্র বিষধর নাগের ফণা—বিষাক্ত ছোবল দেবার জন্য উদ্যত হয়ে উঠেছে।

সর্বশেষে যে চারজন এলেন তাঁদের মধ্যে স্বাহাকে দেখা গেল। সবচেয়ে কনিষ্ঠা সে, রূপবতীও। একটা হায় হায় রব উঠল চারদিকে। যে জনতা মৃত্যুর লীলা দেখতে দেখতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল তারা যেন সহসা শান্ত হয়ে গেল। কর্পূরমঞ্জরী দেখল স্বাহা এগিয়ে আসছে। হাতে ধরে আছে কুশ। বিস্রস্ত চুলের গোছা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে সে পিঠের ওপর। কর্পূরমঞ্জরী রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগল, স্বাহা স্থির পদক্ষেপে এগিয়ে এসে দাঁড়াল দাহকুণ্ডের সামনে। প্রতিটি মন্ত্র সে অকম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করল পুরোহিতদের সঙ্গে সঙ্গে। তারপর তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ শেষ হল। একটি পাত্র থেকে ঘৃত নিয়ে ঢেলে দিল চিতার মধ্যে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন।

বৈশ্বানর তার শেষ গ্রাসের জন্য অগ্নিরসনা মেলে দিল।

একটি ঢাক বাজল না, একটি শঙ্খের ধ্বনি উঠল না। সকলে কি এক আকর্ষণে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে গেল। উর্ধ্বলোকে কোন অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে যুক্তকর উত্তোলন করল স্বাহা। তারপর ঝাঁপ দিল চিতাকুণ্ডে।

জনতার মাঝ থেকে একটি শিশু কেবল আর্তস্বরে মা মা বলে কেঁদে উঠল। কর্পূরমঞ্জরী তাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে ত্রস্ত পায়ে সরে গেল সেখান থেকে।

এতক্ষণে জনতার মুখে জয়ধ্বনি উঠে দিক্‌বিদিক্ কম্পিত হতে লাগল। বিপুল শব্দে ঢাক ঢোল কাঁসরাদি বাদ্যযন্ত্র নিনাদিত হল। সহস্র শঙ্খ একই সঙ্গে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

স্বাহার শিশুকন্যাকে বুকে নিয়ে পালিয়ে এল কর্পূরমঞ্জরী নদীর ঘাটে।

নৌকোর মাঝি বলল, কোথায় যাবেন মা?

ফকীর সাহেবের ঘাট।

কর্পূরমঞ্জরী নৌকায় উঠে বসল। স্রোতের টানে গড়িয়ে চলল

নৌকো। দূর থেকে দেখা গেল ধিকধিক করে তখনও জ্বলছে চিতার আগুন। কর্পূরমঞ্জরীর বুকের ভেতরও আজ কিসের একটা আগুন ধিকধিক করে জ্বলতে লাগল।

পশ্চিমের আকাশে সূর্যাস্ত হচ্ছে, যেন একটা চিতা জ্বলে জ্বলে নিভে যাচ্ছে। কালবৈশাখীর একটা ভয়াল মেঘ উঠেছে আকাশে। বিপুল ঝড়ের আভাস তার গায়ে লেখা।

পাঁচ

কর্পূরমঞ্জরী স্বাহার মেয়েটিকে নিয়ে ভট্টাচার্য মশায়ের কাছ ফিরে গেল না, একেবারে সে এসে উঠল পয়গল খাঁর বাড়ীতে। খাঁ সাহেব কর্পূরমঞ্জরীকে এভাবে অসময়ে আসতে দেখে প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। পরে সব ঘটনা সবিস্তারে শুনলেন। এই বিষয়ে দুজনের মধ্যে বহু পরামর্শ হল।

খাঁ সাহেব বললেন, মা তোমার ইচ্ছাকে কাজে লাগাতে গেলে চাই অমানুষিক শক্তি আর সাহস।

মনে আমার সে সাহসের অভাব নেই বাবা। শুধু নির্যাতিতা মেয়েদের কথা ভেবে আপনি যদি আমার পাশে এসে দাঁড়ান তাহলে কোন কিছুই আপনার মেয়ের অসাধ্য থাকবে না।

খাঁ সাহেব কিছু সময় মৌন থেকে বললেন, সামাজিক ধারাকে মানুষ এমনভাবে মেনে নেয় মা যেখানে সব জেনেও তার বিবেককে সে নিজেই বলি দিয়ে বসে। তার কাছে সত্যের চেয়ে তখন সংস্কার অনেক বড় হয়ে যায়। সেই সংস্কারকে রক্ষা করবার জন্য সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

কর্পূরমঞ্জরী বলল, নারীকে চিতায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে পুড়ে মরতে দেখে যারা উৎকট আনন্দ পায়, তাদের বুদ্ধি দিয়ে বুঝিয়ে এই নির্মম সংস্কারের হাত থেকে ফেরান যায় না। তাদের শক্ত হাতে আঘাত হানতে পারলে তবে যদি তাদের সম্বিত ফিরে আসে।

খাঁ সাহেব কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তারপর একসময় বললেন, আল্লা আর সংগীত নিয়েই আমার দিন কেটে যায়, এ আবার আমায় কোথায় নিয়ে চললি মা ?

কর্পূরমঞ্জরী বলল, আমার অপরাধ নেবেন না বাবা। কিন্তু আমার একটি প্রশ্ন আছে। সন্তান-স্নেহের ভেতরে কি আল্লার সেবা হয় না ? আমাদের শাস্ত্রে বলে, শ্রীকৃষ্ণের বহুরূপ। তিনি কখনো সন্তান, কখনো সখা, কখনো বা স্বামীরূপে আমাদের মাঝে এসে দাঁড়ান। যদি আপনার কোন সন্তান নির্যাতিত হয়, তাহলে সেখানে কি আল্লার অপমান হয় না ?

খাঁ সাহেব অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন কর্পূরমঞ্জরীর দিকে। আজ এই মেয়েটি তাঁকে যে কথা শোনাল এ যে তাঁর নিজের জীবনেরই অনুভূতির কথা। খাঁ সাহেব কোন জবাব দিলেন না। তিনি একটি পরিচারিকাকে দিয়ে ফতেমা বিবিকে ডেকে পাঠালেন।

ফতেমা বিবি এসে দাঁড়ালেন খাঁ সাহেবের পাশে। তেমনি স্নিগ্ধ দুটি চোখ, প্রশান্ত মুখখানি।

এবার কর্পূরমঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে খাঁ সাহেব বললেন, ইনিও তোমাদেরই মত হিন্দুঘরের মেয়ে মা। ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আমি এঁকে লাভ করেছি।

কর্পূরমঞ্জরী বিস্ময়ে কথা বলতে পারল না। সে একদৃষ্টে ফতেমা বিবির দিকে তাকিয়ে রইল।

বলতে লাগলেন খাঁ সাহেব, তুমি হয়ত অবাক হবে মা আমার কথা শুনে, তবু তুমি যখন সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কথা ভাবছ তখন আমার কথা দিয়েই আজ শুরু করছি।

কিছু সময় খাঁ সাহেব নীরবে বসে রইলেন। মনে মনে দেখে নিলেন নিজের অতীতকে। তারপর বললেন, তানসেন আমার সংগীত গুরু ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে সংগীত শিক্ষা করে এক সময় আমি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে গেয়ে বেড়াতে

লাগলাম। এক সময় গীতচর্চা করতে করতে এসে পৌঁছলাম দক্ষিণাত্যে।

আমার উদ্দেশ্য ছিল দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটক সংগীত অনুশীলন করব, আর দেখব বিখ্যাত ভারত নাট্যম্। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও গুরু পেলাম না সংগীত শিক্ষার।

শেষে ভাঙা মন নিয়ে যখন ফেরার উদ্যোগ করছি তখন একদিন হঠাৎ গুরুর দেখা মিলে গেল। সন্ধ্যায় একটি মন্দিরের পাশের গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। কানে ভেসে এল নারী কণ্ঠের গান। নিজে সুরের সাধনা করি, তাই সুরেলা কণ্ঠস্বর শুনলেই বুঝতে পারি গায়কের দক্ষতা।

পথে দাঁড়িয়েই গান শুনছিলাম, হঠাৎ একটি মেয়ে আমাকে হেসে ডাক দিল। তার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম ভেতরে! ও আমাকে একটি আসনে বসতে দিয়ে ভেতরে চলে গেল। হঠাৎ চমকে উঠলাম। এ কোথায় এসেছি আমি। গান শুনতে শুনতে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে এ স্থানটির কথা একেবারেই আমার মনে ছিল না। এ অঞ্চল প্রসিদ্ধ পতিতালয়। আমি উঠে চলে আসব ভাবছিলাম, কিন্তু পারলাম না। পাশের ঘরের দরজা অল্প খোলা ছিল, সেই পথে দেখলাম একটি মেয়ে দেববিগ্রহের সামনে বসে দুটি চোখ বন্ধ করে গান গাইছে। শিল্পীমাত্রেই সাধক। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম এক আশ্চর্য ভাবের ছায়া পড়েছে তার মুখে। চোখে মুক্তোর বিন্দুর মত অশ্রু জমে উঠেছে। আমি ভুলে গেলাম স্থানটির কথা। মেয়েটির বৃত্তি নিয়েও মাথা ঘামালাম না। সেই মুহূর্তে আমি তাঁকে মনে মনে গুরু বলে স্বীকার করে নিলাম। পূজা শেষে এক সময় ও আমার ঘরে এল। আমার কাছে এসে নমস্কার করে বসল। হেসে বলল, বাবুজী তুমি নতুন লোক বলে মনে হচ্ছে। যদি ফুর্তি করতে চাও তাহলে আমার বাঁদী তোমাকে পাশের বাড়ীতে দিয়ে আসবে। আর যদি শুধু

নাচ দেখতে চাও বা গান শুনতে চাও তাহলে এখানে তার ব্যবস্থা আছে।

বললাম, আমি ক্ষুধা নিয়ে এসেছি ঠিক, কিন্তু সে ক্ষুধা দেহের নয়, মনের। তোমাকেই তা মেটাবার ভার নিতে হবে।

বাদশার দরবারের শিল্পী আমি, তাই একেবারে নিঃস্ব ছিলাম না। প্রয়োজন মত অর্থ খরচের সংগতি আমার ছিল। রোজ গিয়ে তার নাচ দেখতাম আর গান শুনতাম। একদিন ও গান করছিল আমার সামনে বসে। গান গাইতে গাইতে ও যেমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল, আমিও তেমনি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। এক সময় ওর সুরের টানে আমার কণ্ঠেও সুর এসে গেল। আমি অমনি সব ভুলে গেয়ে উঠলাম ওর সঙ্গে। থেমে গেল গান। ও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি গায়ক।

বললাম, সুর আমি ভালবাসি। মিঞা তানসেন আমার গুরু।

বিস্ময় ওর চরমে উঠল। সাধু হরিদাসের সাক্ষাৎ ও পেয়েছিল। তাঁর মুখে শুনেছিল তানসেনের আশ্চর্য সুরের কথা। আমাকে বার বার নমস্কার করে বলল, আমি তাঁকে দেখিনি, কিন্তু তাঁর নাম শুনেছি। তাঁর গানের প্রভাবে শুনেছি মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরে পড়ে। আজ আমার কি সৌভাগ্য—তাঁর শিষ্যকে আমার সামনে দেখছি। প্রতি-নমস্কার করে আমি বললাম, আমারও সৌভাগ্য, আজ বহুকাল পরে আমার মনের বাসনা পূর্ণ হল। আমি আমার কর্ণাটক সংগীতের গুরুকে পেলাম। তারপর দুজনে দুজনকার শিক্ষক হলাম। ওকে মিঞা সাহেবের গান শেখাতে লাগলাম, আর আমি শিখতে লাগলাম কর্ণাটক সংগীত আর দেখতে লাগলাম ওর আশ্চর্য নৃত্য।

একদিন গানের শেষে বললাম, আচ্ছা, তুমি আমার একটি কথার উত্তর দেবে?

ও স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বলুন।

বললাম, তুমি এত বড় শিল্পী, তবে এখানে তোমার স্থান কেন?

হাসল ও। মনে হল সে হাসিতে বেদনার ছায়া পড়েছে।

বলল, সমাজই এখানে আমার স্থান নির্দেশ করে দিয়েছে।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, তুমি ত সাধারণ গায়িকা নও, তুমি যে শিল্পী।

আবার হাসল ও। বলল, আমি জাতিতে অচ্ছ্যুৎ, তাই আমার এ শিক্ষাকে ওরা ক্ষমা করতে পারেনি।

বললাম, এ বিদ্যা তাহলে তুমি কি করে আয়ত্ত করলে। সমাজের নৃত্য আর গীতের গুরুই ত তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন!

ও বলল, আমি কারু কাছ থেকে মুখোমুখি বিদ্যা শিক্ষা করিনি। আর আমার মত নিম্নশ্রেণীর অচ্ছ্যুৎ মেয়ের পক্ষে তা সম্ভবও ছিল না। আমি মন্দিরে ঝাড় দিতাম। দেবদাসীরা সংগীত আর নৃত্যের গুরুর কাছে এ দুটি বিদ্যা আয়ত্ত করত। আমি কাজ করতে করতে গান শুনতাম, আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে নাচ দেখতাম। কি করে জানি না এ দুটি বিদ্যা আমার আয়ত্ত হয়ে গেল। একদিন নাচের আসরে সুরযন্ত্রে সুর বেজে উঠল, মৃদঙ্গে বোল বাজল, অমনি আমার ভেতর একটা তরঙ্গ খেলে বেড়াতে লাগল। আমি কাজ ফেলে কখন নাচ শুরু করেছিলাম তা মনে ছিল না, সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখি, মন্দিরের পুরোহিত, নৃত্য-গীতের গুরু আর দেবদাসীরা আমাকে লক্ষ্য করছেন। আমার নাচ দেখে ওরা যে বিস্মিত হয়েছিলেন তা আমি বুঝেছিলাম, কিন্তু ওঁদের নিষ্ঠুরতা কতখানি হতে পারে তা আমি তখন বুঝতে পারিনি।

আমাকে ওরা ধরে নিয়ে গেল। সমাজপতিদের বিচারে সমাজে আমার স্থান হল না। আমাদের শ্রেণীতেও আমাকে সব রকম সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হল। শেষে আমার স্থান হল এই পতিতালয়ে। কিন্তু আমি পতিতা নই তাই ও-বৃত্তি গ্রহণ করতে

পারলাম না। বিগ্রহের সামনে গান করতাম আর নাচ দেখাতাম। আমার গানে আর নাচে আকৃষ্ট হয়ে জনসাধারণ ধীরে ধীরে কাছে আসতে লাগল। এইভাবে ভরণপোষণের একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল আমার।

আবার প্রশ্ন করলাম, যে সমাজ তোমার গুণের আদর করল না, সে সমাজের ওপর তোমার কি আর কোন আকর্ষণ আছে ?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে ও বলল, না। এখন আমার সমাজ শিল্পীর সমাজ। আর কোন সমাজে আমার প্রয়োজন নেই। যখন আমি নৃত্য করি তখন মনে হয় ঐ যে অদূরে সমুদ্র, ওর তরঙ্গ খেলা করছে আমার সারা দেহে। আর যখন গান করি তখন মনে হয় সমুদ্রের কল্লোল আমার কণ্ঠ জুড়ে কথকতা করে চলেছে।

বললাম, তুমি যাবে আমার সঙ্গে সুরের গুরু মিঞা তানসেনকে দেখতে ?

আমার কথায় ও আনন্দে অধীর হল। চোখেমুখে ওর সে কি আগ্রহ! বলল, তুমি আমাকে তোমার সঙ্গী করে নিয়ে যাবে কি ? তোমার সমাজ কিছু বলবে না ?

বললাম, আমার সমাজও শিল্পীর সমাজ। সেখানে জাতিভেদ নেই। তোমাকে যদি চিরদিনের সঙ্গী করে নিয়ে যাই, তুমি কি রাজী হবে ?

ও মাথা নীচু করল। চোখ দিয়ে ওর জল পড়তে লাগল। এক সময় মুখ তুলে বলল, এ আশ্রয় আমার আর ভাল লাগছে না। এর থেকে মুক্ত করে তুমি আমাকে সুরের রাজ্যে নিয়ে চল।

আল্লাকে কোটি কোটি সেলাম জানিয়ে মনে মনে বললাম, পাঁকেই তুমি ফুলের সেরা পদ্ম ফোটাও। আমিও আজ পাঁক থেকে পঙ্কজিনীকে তুলে নিলাম। মুখে বললাম, তুমি আমার আল্লার দান। যেখানে মানুষের নির্যাতন, সেখানেই আল্লা তাঁর অপার করুণার হাতটি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

থামলেন খাঁ সাহেব। তারপর বললেন, ফতেমাবিবি আমার সেই দান। সমাজের নির্যাতনের মাঝখান থেকে আমি ওঁকে তুলে এনেছি মা। তাই নির্যাতিতা নারীর সেবা করতে পেলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। তবে মা আমাকে তুমি ভুল বুঝ না। আমি বৃদ্ধ হয়েছি বলেই তোমার দেওয়া এতখানি দায়িত্ব বহন করতে পারব কিনা তাই ভাবছিলাম। আর তাছাড়া আমি এখানে একা মুসলমান জায়গীরদার। আমার চারদিকে হিন্দু ভূস্বামীরা রয়েছেন। তাঁরা কেউ কেউ প্রবল ক্ষমতাশালী।

কর্পূরমঞ্জরী স্তব্ধ হয়ে, খাঁ সাহেব আর ফতেমাবিবির কাহিনী শুনছিল। খাঁ সাহেবের কথা শেষ হলে ফতেমাবিবি একটু সলজ্জ হাসি হেসে কর্মান্তরে চলে গেলেন।

কর্পূরমঞ্জরী বলল, বাবা আপনার অগাধ করুণা। আপনার মনোবলই আমাকে এই দুরূহ কাজে প্রেরণা দেবে। তাছাড়া বাধা থাকলেই তাকে ভাঙ্গবার ইচ্ছাও প্রবল হবে। আপনি আল্লার কাছে প্রার্থনা করুন যেন মহৎ সংকল্পে আমরা জয়ী হতে পারি।

এরপর খাঁ সাহেব আর কর্পূরমঞ্জরীতে মিলে নানা ধরনের বাস্তব পরিকল্পনা আর প্রস্তুতি চলল। সম্পূর্ণ গুপ্তভাবে গড়ে উঠল একটি লাঠিয়াল দল। দ্রুতগামী কয়েকটি ছিপও একাজের জন্য তৈরি করা হল ।

এমন নিঃশব্দে কাজ এগিয়ে চলল যে খাঁ সাহেবের জায়গীরের প্রজারাও এ ব্যাপারের কোন আভাস পেল না।

চর নিযুক্ত হল সংবাদ সরবরাহের জন্য। নদীতীরবর্তী গ্রাম গুলিতেই প্রথমে কাজ শুরু করতে হবে, কারণ যাতায়াতের তাতে অনেক সুবিধা। মেহেদীনগর গ্রাম থেকে প্রথম খবর পাওয়া গেল। শবদাহের সময়টিও বিশেষ অনুকূল। সন্ধ্যার পূর্বে সৎকার সম্ভব নয়।

বিশ বৈঠার একখানি ছিপে রওনা দিল কর্পূরমঞ্জরী। সঙ্গে মাঝি মাল্লা ছাড়াও সশস্ত্র লাঠিয়াল। প্রয়োজন হলে সড়কি চালাবে

তারা। খাঁ সাহেব কিন্তু কর্পূরমঞ্জরীর সঙ্গে গেলেন না। একবার তাঁকে কেউ চিনতে পারলে, কথাটা রাষ্ট্র হয়ে পড়বে। তখন হিন্দু জমীদারেরা তাঁর বিরুদ্ধে দাঙ্গা বাঁধাতে পেছপা হবে না।

বেলা দ্বিপ্রহর। খাঁ সাহেবের ঘাট থেকে ছিপ রওনা হয়ে গেল। বাতাস বইছিল। পাল তুলে দেওয়া হল নৌকোয়। সন্ধ্যার অনেক আগেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে হবে। এখন ভর জোয়ার, শেষ দিকে ভাটার টানে অনুকূল স্রোত পাওয়া যাবে। মাঝিরা দাঁড় নামাল। বিশখানা দাঁড় টেনে যেন বিচিত্র এক রাজহংসী উড়ে চলে গেল।

সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমের আকাশে। নৌকো এসে ভিড়ল দরিয়াপুরের মোহনার কাছাকাছি। দূরে জলরেখা দেখা যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে বাতাসে ভেসে আসছিল ঘোর কল্লোল। নদীর এপারে দরিয়াপুর আর ওপরে মেহেদীনগর। ছিপ গিয়ে ভিড়ল নদীর খাড়াইএর পাশে একটা ঝাকড়া তেঁতুল গাছের নীচে।

তেঁতুলগাছের তলা থেকে একটি পালকি নেমে এল ধীরে ধীরে। পালকির চারদিকে পাতলা কাপড়ের চিক ফেলা। পালকিটিকে ছিপে তোলা হল। বেহারাদের কেউ আর ছিপে এল না। পূর্বের ব্যবস্থামত মাল্লাদের ভেতরেই মাহারা সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোককে নেওয়া হয়েছিল।

এরপর সন্ধ্যার আবছা ঘনিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ছিপে পাল তোলা হল। দাঁড় নামল। দরিয়াপুরের কূল ছেড়ে ছিপ আড়পার হয়ে এসে পৌঁছল মেহেদীনগরের কূলে। ছোট একটি খাল এসে মিশেছে নদীতে। খালটিকে লোকে বলে কুঞ্জিপুরের খাল। দু'দশ গাঁয়ের লোকে এই খালের পথে ডিঙ্গি নৌকোয় তাদের সওদা নিয়ে এসে মেহেদীনগরের গঞ্জে কেনাবেচা করে।

সেদিন ছিল হাটবার। সন্ধ্যার আগেই হাট ভেঙে গিয়েছিল যথারীতি। কিন্তু হাটুরেদের ভেতর কেউ কেউ থেকে গিয়েছিল।

আজ মেহেদীনগরের জমিদার ব্রজবিলাসবাবুর লোকান্তর ঘটেছে। তাঁর শবদাহের আয়োজন হয়েছে নদীতীরে। অবশ্য এই দাহ দেখবার জন্য কেউ থাকত কিনা সন্দেহ, তবে তার চেয়েও একটি বড় খবর ছিল, আর তাই নিয়ে সকলে মেতেছিল জল্পনা কল্পনায়। ব্রজবিলাসবাবুর তিন বিয়ে। প্রথমা সিঁথের সিন্দুর আর মাথায় স্বামীর পদধূলি নিয়ে আগেই স্বর্গারোহণ করেছিলেন। তার বহু বছর পরে প্রায় প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় পৌঁছে ব্রজবিলাসবাবু পর পর আরও দুটি বিয়ে করেন। আজ সেই দ্বিতীয় আর তৃতীয় পক্ষের পত্নীরাই তাঁর সহমৃতা হবেন।

এ দৃশ্য দেখা যে একটা মহা পুণ্যের কাজ তাতে সন্দেহ কি! আশপাশের গাঁ থেকেও বহু লোক তাদের স্ত্রীদের নিয়ে এসেছে এই পুণ্যদৃশ্য দেখাবে বলে। এ দৃশ্য নারীরা যত দেখবে ততই তাদের মঙ্গল। দেখতে দেখতে তাদের ভয় কমবে। আর পতিই যে ইহলোক আর পরলোকের একমাত্র দেবতা তা তারা উপলব্ধি করবে।

শ্মশানে শব এসে গেল। চিতা রচনা আগেই হয়ে গিয়েছিল। সকলে মিলে ধরাধরি করে দুটি স্ত্রীকে সেখানে নিয়ে এল। যথাবিহিত মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চিতার ওপর শবকে শোয়ান হল। তার পর এক স্ত্রীকে মন্ত্রপাঠ করান হল। বেচারা বয়সে কিশোরী। ভয়ে তার মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। পাছে চিতার আগুনে একজনকে পুড়ে মরতে দেখলে সে আরও ভয় পেয়ে যায়, তাই তার চেয়ে বড়টিকে পরে পোড়ানর ব্যবস্থা হয়েছিল।

সবাই মিলে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে চিতার কাঠের ওপর শুইয়ে বেঁধে দিল। পাছে আগুনের আঁচ পেয়ে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করে তাই এ ব্যবস্থা। তারপর আসতে লাগল কাঠের বোঝা। মেয়েটির ওপর সেই সব বোঝা বোঝা কাঠ চাপান

হল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল তার। সে আর্ত একটা চীৎকার করল। অমনি তার কান্নাকে ঢাকা দেবার জন্য দ্বিগুণ জোরে বেজে উঠল ঢাক ঢোল।

ইতিমধ্যে মেয়েটি কেমন করে হাতের বাঁধন খানিকটা আলগা করে ফেলেছিল। তাই খোলা হাতখানা দিয়ে সে কাঠগুলো ঠেলে ফেলতে লাগল। পাশে দাঁড়িয়েছিল দাহকারীরা। হাতে তাদের বাঁশের লাঠি। অমনি একসঙ্গে কিশোরীটির মাথায় গিয়ে পড়ল দশ বিশটা লাঠির বাড়ি। সমস্ত শরীরটা তার প্রবল একটা ঝাঁকুনি খেয়ে মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল। কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল খানিকটা তাজা রক্ত। বীভৎস দৃশ্য। চীৎকার করতে লাগল ব্রজবিলাসবাবুর অন্য স্ত্রীটি। পুরোহিতের নির্দেশে সবাই মিলে তাকে খানিকটা আফিম খাইয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে স্থির হল, আর ঝিমুতে লাগল কেমন একটা নেশার ঘোরে।

এদিকে কর্পূরমঞ্জরী তার দলবল নিয়ে আসতে একটু বিলম্ব করছিল। কারণ আজকে বাজারের দিন। এ অবস্থায় গেলে অনেক লোকের মুখোমুখি হতে হবে। সন্ধ্যে ঘনিয়ে উঠলেই সুবিধে, তখন হাটের লোকেরা অনেকেই চলে যাবে।

কর্পূরমঞ্জরী গেরুয়া কাপড় পরে আর রুদ্রাক্ষের মালা গলায় জড়িয়ে ভৈরবী মা সাজল।

সঙ্গে রইল খালিগায়ে তান্ত্রিক সাধুর দল। ভৈরবী চলল পালকিতে চেপে, আর সাধুর দল লাঠি আর সড়কি নিয়ে চলতে লাগল আগুপাছু।

তারা যখন শ্মশানে এসে পৌঁছল তখন ব্রজবিলাসবাবুর ছেলে চিতাতে অগ্নি-সংযোগের উদ্যোগ করছে।

হর-হর-মহাদেও ধ্বনি করতে করতে এসে পড়ল তান্ত্রিকের দল।

ভৈরবী মাঈকী জয়, বলতে বলতে পালকি নামাল তারা শ্মশানের মাঝখানে। শ্মশানকৃত্য যারা করতে এসেছিল তারা এই

বিচিত্র সাধুর দলটিকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। দর্শকেরা জোড়হস্ত হয়ে নমস্কার করল। ভৈরবী মা পালকি থেকে বেরিয়ে চিতার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

চারদিক নিস্তব্ধ। ঘন অন্ধকার। মহাশ্মশান। মাঝে মাঝে দু'চারটি মশাল জেলে রাত্রির ভয়াবহতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তার মাঝে এই ভৈরবী আর তান্ত্রিকদলের আগমনে সকলে একটা কিছু আশ্চর্য ঘটনা ঘটবার কথাই ভাবতে লাগল।

ভৈরবী চিতার চারদিকে ঘুরে ঘুরে সব কিছু লক্ষ্য করলেন। মশালের আলোয় দেখলেন একটি মেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় স্বামীর সঙ্গে শুয়ে রয়েছে। মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বুঝলেন ইতিপূর্বেই তার প্রাণ দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। অন্য যে মেয়েটি দূরে বসে ঝিমুচ্ছিল তার বেশবাস দেখে বুঝলেন চিতায় ওঠার জন্য ভাগ্যহীনাটি অপেক্ষা করে আছে।

ভৈরবী চিতার কাছে ফিরে গিয়ে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। সকলে সবিস্ময়ে তাঁর ক্রিয়াকর্ম দেখতে লাগল। সে অবস্থায় কেউ তাঁকে কোনরূপ বাধা দেবার কথা চিন্তাও করতে পারল না।

কিছুক্ষণ এমনি অবস্থায় কাটল। তারপর ভৈরবী ইঙ্গিতে একটি তান্ত্রিক সাধুকে কাছে ডেকে অস্ফুটে কি বললেন। অমনি সেই সাধু জলদগম্ভীর স্বরে সমবেত দর্শকদের উদ্দেশ করে বললেন, তোমাদের সৌভাগ্য যে আজ ভৈরবী মা তোমাদের কাছে এসে দর্শন দিয়েছেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞা মহামায়া। তিনি বলছেন, এই শবে প্রাণসঞ্চার করা সম্ভব। যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে তাহলে মা কৃপা করতে পারেন।

সকলেই স্তম্ভিত হয়ে কথাগুলি শুনল। মৃতদেহে প্রাণ দেওয়া, এ যে একেবারে অলৌকিক ঘটনা। পরস্পরের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। ব্রজবিলাসবাবুর আত্মীয়স্বজন আনন্দে অধীর হয়ে ভৈরবী মায়ের উদ্দেশ্যে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করল। কিন্তু পুরোহিতেরা

ভাবলে তাদের এত বড় উদ্যোগ আয়োজন সবই নষ্ট হয়। তাই তারা ভিড়ের ভেতর প্রচার করতে লাগল, এ অনাচার। দেবতার যা আকাঙ্ক্ষা তাই পূরণ হওয়া উচিত। অসম্ভব কিছু ঘটালে দেবতা রুষ্ট হতে পারেন।

সাধারণ মানুষদের ভেতর তখন আলোচনা চলল। জ্যান্ত পুড়ে মরবে তাই তারা দেখবে, না মরা মানুষ বেঁচে উঠবে তাই দেখবে। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি চলল কিছুক্ষণ। তারপর ঠিক হল, তারা মরা মানুষের বাঁচাটাই দেখবে। কারণ জ্যান্ত পোড়ানর দৃশ্য অনেক দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু মরার বেঁচে ওঠা এ যে বহুজন্মের পুণ্যি না থাকলে দেখা যায় না। সকলে তখন 'জয় ভৈরবী মাঈকী জয়' এই ধ্বনিতে আকাশবাতাস কাঁপিয়ে তুলল। পুরোহিতেরা ধীরে ধীরে সরে পড়ল সেখান থেকে।

সকলকে তখন দু'হাত তুলে থামতে বললেন ভৈরবী মাঈ।

মন্ত্রের মত কাজ হল। শ্মশান নিস্তব্ধ। ভৈরবী বুঝলেন, তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির অসুবিধে হবে না।

তিনি বলতে লাগলেন, আজ মহা পুণ্যলগ্ন। কালভৈরবের আজ দাননিশি। তাঁর কাছে প্রার্থনার জন্য কতদূর থেকে এলাম এই মহাশ্মশানে। আর এসেই দেখলাম এই সৎকারের ব্যবস্থা। কালভৈরবের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। মৃতদেহে প্রাণ আসুক।

কিছুক্ষণ চোখ বুজে ধ্যান করলেন ভৈরবী। তারপর বললেন, চিতা থেকে শবগুলি টেনে বের করতে হবে। ওদের নিয়ে যেতে হবে নদীর জলে স্নান করাতে। স্নানান্তে পূজা হবে। এই মহাশ্মশানে সারারাত্রি ধরে। তারপর প্রাণ আসবে মৃতদেহে।

চিতা থেকে মৃতদেহ দুটি নামান হল। ভৈরবীর আদেশে জীবিতা স্ত্রীকেও সঙ্গে নেওয়া হল। তারপর সাধুরা তাদের লাঠির মাথায় কাপড় জড়িয়ে, তাতে সৎকারের জন্যে আনা ঘি ঢেলে মশাল তৈরি করল।

দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল মশাল। পালকিতে ব্রজবিলাসের জীবিতা স্ত্রীকে উঠিয়ে নিলেন ভৈরবী মাঈ। আর দুটি মৃতদেহকে বহন করে নিয়ে চলল ব্রজবিলাসের আত্মীয়-স্বজন। শ্মশান থেকে কিছু দূরেই নদী। পালকির আগে পাছে রইল মশালধারী সাধুর দল। তাদের পেছনে অনুসরণ করে চলল শববাহী আর কৌতূহলী জনতা। রাতের অন্ধকারে ঘনঘন উচ্চারিত হল কালভৈরবের জয়ধ্বনি।

খালের পথ ধরে দলটি এসে পৌঁছল নদীর কূলে। নদীতে তখন জোয়ার লেগেছে। সমুদ্রের তুমুল গর্জন শোনা যাচ্ছে। ভৈরবী মাঈ জনতাকে নদীর চরে বসতে বলে পালকি নিয়ে আগেই নেমে গেলেন নদীতে। খাড়াই এর তলায় নৌকো বাঁধা ছিল। তাই ওপরের নদীতীর থেকে নৌকো দেখা যাচ্ছিল না। এবার নীচের থেকে তিনি আদেশ করলেন, অন্যান্য সাধুদের নেমে আসতে। জনতা শব নিয়ে বসে রইল। সাধুরা মশাল নিয়ে তরতর করে নেমে গেল নদীর জলে। তারপর চোখের পলকে নৌকোয় উঠে গেল তারা। সমস্ত ঘটনাটি বোঝার আগেই পাল উঠল। বিশখানা দাঁড় নামল। অপেক্ষমান জনতাকে হতবাক করে দিয়ে তীরবেগে ছিপ বেরিয়ে গেল মেহেদীনগরের কূল ছেড়ে। শুধু অন্ধকারের বুকে জেগে রইল মশালগুলি। মনে হল যেন একটি অগ্নি-নাগ অন্ধকার নদীর বুক চিরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

নদীতীরে গাঁয়ের মাথায় একসময় জেগে উঠল কৃষ্ণা চতুর্থীর চাঁদ। ধীরে ধীরে অন্ধকার কেটে আলো ফুটে উঠতে লাগল। নদীর জলে এসে পড়ল চাঁদের আলো। দাঁড়ের ঘায়ে হীরের টুকরোর মত সেই আলো ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে।

পালকির ভেতর ঘুমুচ্ছিল মেয়েটি।

নৌকোয় উঠেই পালকি থেকে বেরিয়ে এসেছিল কর্পূরমঞ্জরী। পাটাতনে বসে সে এতক্ষণ তাকিয়েছিল নদীর স্রোতের দিকে। সে যখন এসেছিল তখন চলছিল খরভাঁটার টান। নদীর আকার

শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এখন জোয়ার জেগেছে। কত দীর্ঘ মনে হচ্ছে নদীকে। যে জল ফিরে গিয়েছিল, তাই আবার শত উচ্ছাসে ফিরে আসছে। কর্পূরমঞ্জরীর মনে হল, তার জীবনটাও এমনি ধারা বয়ে চলেছে। মৃত্যুর টানে কোথায় ভেসে চলেছিল, তারপর আবার ফিরে এসেছে জীবনের রাজ্যে।

এখন সে চলবে জীবনের জোয়ার বেয়ে। সঙ্গে নিয়ে যাবে ভাটার টানে ভেসে যাওয়া শত শত প্রাণকে উদ্ধার করে। চাঁদের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কর্পূরমঞ্জরীর চিন্তায় ছেদ পড়ল। সে উঠে এল পালকির ধারে। পালকির দরজাটা বন্ধ ছিল। কর্পূরমঞ্জরী খুলে দিল। অমনি এক ঝলক চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়লো পালকির ভেতর। মেয়েটি অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। কর্পূরমঞ্জরী মেয়েটিকে ভাল করে দেখবার সুযোগ পায়নি আগে। এখন চাঁদের আলোয় সে ঘুমন্ত মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। এ কি! ভোজবাজিতে যেন এক মুহূর্তে কি কাণ্ড ঘটে গেল। কর্পূরমঞ্জরী বুকে চেপে ধরল ঘুমন্ত মেয়েটিকে। মেয়েটি জেগে উঠে প্রথমে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল কর্পূরমঞ্জরীর দিকে। সব ঘটনাটা সে একবার তলিয়ে দেখে নিল। তারপর অবাক হয়ে বলল, কর্পূর, তুই! এ আমি কোথায় এসেছি!

কর্পূরমঞ্জরীর আনন্দে চোখের জল গড়িয়ে আসছিল। সে মেয়েটিকে তেমনি জড়িয়ে ধরে বলল, কাদু, তুই আমার বুকে রয়েছিস ভাই।

বাল্যে যে দুটি সখী ছুটে বেড়াত গ্রামের পথেঘাটে, এক মুহূর্ত দুজনকে ছেড়ে যারা থাকতে পারত না, তাদেরই একদিন সমাজের বিধানে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হল। বিবাহিত জীবনে কে কোথায় যায় তার খোঁজ কে রাখে। আজ সেই বাল্যসখী কাদম্বিনী আর কর্পূরমঞ্জরীর দেখা হয়ে গেল। দেখা হল বিধাতার আশ্চর্য বিধানে।

পরিচয়ের পর দুই সখী চোখের জল ফেলল। তারপর পরস্পরের জীবনের কথা নিয়ে তারা আলোচনা করল কতক্ষণ।

কাদম্বিনী একসময় বলল, আমি এখন কি করব?

কর্পূরমঞ্জরী হেসে বলল, জীবনটা যখন আমি দিয়েছি, তখন তার ভারটা আমার ওপরেই ছেড়ে দে।

এ জীবনটা আর কোন কাজে লাগবে কি ভাই? কাদম্বিনীর কথায় হতাশার সুর।

জীবনের মূল্য কি এত সহজ কাদু? মানুষের প্রাণ রয়েছে বলেই না জগতটা এত সুন্দর। এই আলো, এই গান, এমন স্নেহমমতা এসব প্রাণেরই খেলা। দুচোখ বন্ধ হলে এর কিছুই আর থাকবে না। প্রাণ না থাকলে পৃথিবীর যে কোন মানেই থাকে না কাদু।

কাদম্বিনী কোনদিন এসব কথা তলিয়ে দেখেনি। সারাদিনের ছোট সংসারের কাজকর্মের বাইরে যে জীবনের আলাদা কোন মূল্য আছে তা সে বুঝতে পারেনি। বাল্যের আনন্দ তার একটু আভাস দিয়ে কখন সরে গেছে। বিয়ের পর সারাদিনরাত্রি একটা লম্বা ঘোমটার মাঝে চোখ দুটো তার আবদ্ধ হয়ে থাকত। আজ হঠাৎ যেন সে জীবনের নতুন একটা মানে খুঁজে পেল। এই বহতা নদীধারায়, জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি আলোয়, দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের গা ঘেঁষে যেতে যেতে বাল্যসখীর দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, এ জীবনকে হত্যা করবার অধিকার কারু নেই। এই মহাবিশ্বের প্রয়োজনেই জীবনকে সহস্র বাধার মাঝখানে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। এই জগত যেন আমাদের প্রাণের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি জেগে থাক। আমি তোমাকে অফুরন্ত আনন্দ দেব।

ফকীর সাহেবের ঘাটে নৌকো এসে যখন ভিড়ল তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। জোয়ারের পর অনেকখানি পথ ভাঁটা ঠেলে আসতে হয়েছিল তাদের—তাই এ বিলম্ব। কিন্তু তত রাতেও ফকীর

সাহেবের চোখে ঘুম ছিল না। তিনি এসে বসেছিলেন ঘাটের পাশে। ছিপখানাকে কাছাকাছি আসতে দেখে তিনি 'কর্পূর, কর্পূর' বল্লে ডাক দিলেন। কর্পূরমঞ্জরী সাড়া দিল। কূলে উঠতেই কর্পূরমঞ্জরীকে জড়িয়ে ধরলেন খাঁ সাহেব। এতক্ষণ তিনি যে গভীর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের মাঝখানে কাটাচ্ছিলেন কর্পূরমঞ্জরী তা বুঝতে পেরে বৃদ্ধের গায়ে হাত বুলিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করে বলল, সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে সব কাজ শেষ করে এসেছি বাবা। তবে যেতে খানিকটা দেরি হয়েছিল, তাই একটি কিশোরীকে বাঁচাতে পারলাম না।

কাদম্বিনী নীরবে মাথা নত করে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল। কর্পূরমঞ্জরী তার হাত ধরে টেনে নিয়ে এল খাঁ সাহেবের কাছে। বলল, দেখ বাবা, আমি কাকে নিয়ে এসেছি।

খাঁ সাহেব বললেন, সুখী হও মা। মরণকে জয় করেছ, এখন জীবনকে ভোগ কর। মৃত্যু তো যে কেউ ঘটাতে পারে, কিন্তু জীবন দিতে কে পারে মা? তাই জীবনটা এত অমূল্য।

কর্পূরমঞ্জরী বলল, বাবা, কাকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি বলত?

ফকীর সাহেব হেসে বললেন, আমার আর একটা মেয়েকে।

কর্পূরমঞ্জরী কাদম্বিনীকে জড়িয়ে ধরে বলল, এ আমার সখী—ছেলেবেলার সাথী।

খাঁ সাহেব এরকম একটা যোগাযোগে যেমন অবাক হলেন, তেমনি মনেপ্রাণে খুশিও হলেন।

এরপর দিবারাত্রি পয়গল খাঁর গৃহে চলল জল্পনা-কল্পনা। নতুন নতুন খবর আসতে লাগল আর অভিনব পন্থায় তার সমাধানও হতে লাগল। এখন কাদম্বিনীও এগিয়ে এল কর্পূরমঞ্জরীর সাহায্যে। কোথা দিয়ে কেটে গেল একটি বছর। দুই সখীতে অসাধ্যসাধন করল। পয়গল খাঁ তাঁর মীনামহলে অসহায় মেয়েদের আশ্রয় দিলেন।

মেয়েদের নিয়ে কি করা যায়, প্রথম প্রথম এই সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে গেল। কাজের বিভাগ করে দেওয়া হল। পালা করে রান্নার কাজ, সব্জির বাগান তৈরি করা, এমন কি তাঁতের কাজও করতে লাগল তারা।

মেয়েদের তৈরি সব্জি আর কাপড় হাট-বাজারে বিক্রি হতে লাগল।

ফতেমা বিবি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। মেয়েদের আসার পরে তাঁর কাজ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। মেয়েদের মধ্যে যাদের গানের গলা ছিল তারা পয়গল খাঁর কাছ থেকে গান শিখতে লাগল। অন্যদিকে ফতেমা বিবি হলেন তাদের নাচের গুরু। এখন মীনা-মহলে শোনা যায় মঞ্জীর-ঝঙ্কার। কখনো গানে গানে বাতাসে কেঁপে কেঁপে ওঠে সুরের তরঙ্গ।

দবীর খাঁ কেবল সংগত করেন না, তিনি কথক নাচেও বিশেষ পারদর্শী। কথক আর ভারত নাট্যম্ দুটিই শিখতে লাগল মেয়েরা। খাঁ সাহেব তাঁর সেই পড়ো মসজিদটিতে রোজ প্রভাতে প্রার্থনা করতে যান। এখন তাঁর প্রার্থনার ভেতর আর একটি কথা তিনি নতুন যোগ করেছেন, আমার মেয়েদের কল্যাণ কর আল্লা। তিনি মীনামহলের নাম পরিবর্তন করে তার নতুন নামকরণ করেছেন —কাঞ্চনপুরী। মেয়েদের তিনি কাছে ডেকে বলেন, খাঁটি সোনা মা তোমরা। এতকাল খনির আঁধার কূপে চাপা পড়ে ছিলে, এখন বাইরে এসেছ, তাই তোমাদের মূল্য বোঝা যাচ্ছে। প্রতিটি মানুষের মাঝে আল্লা অফুরন্ত সম্পদ দিয়ে পাঠিয়ে দেন এই দুনিয়ায়। তিনি বলেন, আমি বীজ দিয়েছি, তোমরা ফসল ফলাও। আমরা যদি খাঁটি জমিতে শ্রম স্বীকার করে সেই বীজ বপন না করি, তাহলে আমরা যথার্থ সম্পদের অধিকারী হব কী করে। তোমরা আঁধার ভূমি থেকে আলোয় এসেছ মা, এখন সাধনার ভেতর দিয়ে নিজেদের জাগিয়ে তোল।

মেয়েদের উদ্ধারের কাজ যেমন এগিয়ে চলে, তেমনি চলতে থাকে জীবনে তাদের প্রতিষ্ঠার কাজ। মহামৃত্যুর সমুদ্র পার হয়ে তারা যেন জীবনের কূলে এসে হাঁফ ছাড়ে। আশ্বাস পায় আলোবাতাসের, নতুন করে জীবনকে গড়ে তোলার। সমাজ তাদের নেবে না, কিন্তু তারা নিজেদের সমাজ নিজেরাই তৈরি করে নেবে। সে সমাজের শুভাশুভ নির্ভর করবে তাদের নিজেদের বিচারবুদ্ধির ওপরেই।

কর্পূরমঞ্জরীকে মেয়েরা সবাই ভালবাসে। সবচেয়ে ভাল সে নাচতে পারে বলে নয়, কর্পূরমঞ্জরী তাদের মুক্তি দিয়েছে আর দিয়েছে নতুন জীবনের সন্ধান। এই অনুভূতিতেই কর্পূরমঞ্জরী তাদের হৃদয়কে ছুঁয়েছে। তাদের কেউ যখন নৃত্যের একটি বিশিষ্ট মুদ্রা আয়ত্ত করে আনন্দে অধীর হয়, তখন সে আনন্দ প্রকাশ করে তারা কর্পূরমঞ্জরীকে জড়িয়ে ধরে। গানে কৃতিত্ব অর্জন করলে তা কর্পূরমঞ্জরীকে না শোনাতে পারলে তাদের তৃপ্তি আসে না।

আর কর্পূরমঞ্জরী! সে ভুলে গেছে তার অতীত। সে যেন নতুন পৃথিবীতে নতুন করে জন্ম নিয়েছে। একটি অসহায় মেয়েকে উদ্ধার করে সে ভাবে নিজেকেই সে মৃত্যুর হাত থেকে জয় করল আর একবার। তাই প্রতিটি মেয়ের ওপরে তার মমতা—যেমন মমতা তার নিজের দেহের, নিজের মনের ওপর।

সে মাঝে মাঝে অবসর সময়ে নদীর তীরে ঘুরে বেড়ায়। তার মনে হয়, কি বিচিত্র, কি উদার এই পৃথিবী। এত আলো এত প্রসন্নতা যেখানে, সেখানে মানুষ কেন বঞ্চিত হয় প্রাণ থেকে। এই নদীতে সে জোয়ার-ভাঁটার স্রোতধারা দেখে, আর দেখে পাখিদের ইতস্ততঃ উড়ে ফেরা। ওদের দেখে তার মনে হয়, সেও আজ এমনি মুক্ত, এমনি স্বাধীন।

এই আনন্দের মাঝে যে অতীতকে সে মুছে ফেলেছে, সেই অতীতের একটি ছেঁড়া পাতা হঠাৎ উড়ে আসে তার সামনে।

অস্পষ্ট অক্ষরে তার ওপর লেখা থাকে একটি সকরুণ জীবনের কথা। সে কথা কেতকীমঞ্জরীর।

এক সাধারণ বামুনের ঘরে জন্ম তাদের। ছেলেবেলা থেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তারা। মা-বাবা আর দুটি বোনকে নিয়েই তাদের সংসার। কর্পূরমঞ্জরী ছোট আর কেতকীমঞ্জরী বড়। বিধাতা তাদের অর্থ দেননি ঠিক, কিন্তু রূপ তাদের ছোট কুঁড়েঘরের ভেতর ধরে রাখা যায়নি। প্রতিবেশীরা বড় বোন কেতকীমঞ্জরীকে 'তিলোত্তমা' বলেই ডাকত। কিন্তু সেই রূপই তার কাল হোল। গ্রামের জমিদার বাড়ীতে উৎসব দেখতে গিয়ে সে পড়ল এক মগ দস্যুদলের হাতে। তারা জমিদারের অর্থ হরণ করল, আর সঙ্গে নিয়ে গেল দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা আর জাতি। কর্পূরমঞ্জরী তখন খুব ছোট। দিদিকে সে খুব ভালবাসত। সংসারে দিদিই ছিল তার একমাত্র সঙ্গী। দারিদ্র্যের মাঝখানে কতদিন তাদের উপোসী থাকতে হয়েছে। সে ছোট মেয়ে—তাই ক্ষিদের জ্বালায় কেঁদেছে। কিন্তু এই দিদিই তাকে বুকে করে তার সমস্ত দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছে। সেই দিদিকে হারিয়ে প্রথম প্রথম সে খুব কেঁদেছিল। সেই বালিকা বয়সে দিদিকে ছেড়ে থাকতে সে বড় অসহায় বোধ করেছিল। কিন্তু সেই দিদিই একদিন আবার যখন ফিরে এল, তখন সে আনন্দে জড়িয়ে ধরেছিল তাকে। কত অভিযোগ ছিল দিদির ওপরে তার। কেন সে তাকে কাছছাড়া করে রেখেছিল এতদিন। দিদি সেদিন তার অভিযোগের কোন উত্তর দেয়নি। শুধু টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল তারই মুখের ওপর ঝরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সমাজে সেদিন দিদির স্থান হয়নি। সেদিন মগদোষে দিদি হয়েছিল দুষ্টা। তাই জাতিচ্যুত হবার ভয়ে দরিদ্র বাবা-মাও সাহস করে মেয়েকে বাড়ীতে একটু ঠাঁই দিতে পারেনি। তার মনে আছে, এক সন্ধ্যায় দিদি ঘর থেকে আবার বেরিয়ে গিয়েছিল। বাবা বসেছিলেন নারায়ণ মূর্তির সামনে। মা আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেছিল,

আজ রাতের মত তুই থেকে যা মা। আঁধারে কোথায় পথ দেখে যাবি। মায়ের কথায় দিদি শুধু একটু হেসেছিল। দিদির সেদিনের রূপটি আজও তার মনে আছে। চোখেমুখে সে কী দীপ্তি! বলল, যে সমাজ মা-বাবার স্নেহ থেকে সন্তানকে বঞ্চিত করে, সে সমাজে এক মুহূর্তও থাকা যে পাপ মা। এই অন্ধকারে গাঁ ছেড়ে চলে যেতে পারলে এই সমাজের মানুষগুলোর মুখ আর আমাকে দেখতে হবে না। যারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসে আমি ভুলই করেছি। যে সমাজ রক্ষা করতে জানে না, শুধু ত্যাগ করতেই জানে, সে সমাজে থাকার তিলমাত্র আগ্রহ আর আমার নেই।

দিদির এই কথাগুলো সে পরে বহুবার মায়ের মুখ থেকে শুনেছে, শুনতে শুনতে মনে গাঁথা হয়ে গেছে তার। তবু ঐ কথাগুলোর ওপরেও ভেসে ওঠে দিদির মুখের সেই ছবিখানা। গাঁ ছেড়ে চলে যাবার দিন মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে দিদি যখন কথা বলছিল তখন সে তার মুখখানা দেখেছিল। কি আলো সে মুখের! যেন অন্ধকারের মাঝখানে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

সেই দিদি কোথায় হারিয়ে গেল। আজ এই নতুন জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাই তার মনে পড়ে দিদির কথা। মনে হয় দিদি যদি এমন দিনে তার কাছে থাকত, তাহলে তার অভিমানী দিদিকে সে আজ বলতে পারত, দেখ দিদি, তোমার জন্যে আমি নতুন সমাজ গড়েছি। সেদিনের সমাজ তোমাকে ঠাঁই দেয়নি, তাই আজ নতুন সমাজের পত্তন করে আমি সে দিনের প্রায়শ্চিত্ত করলাম। তুমি এস আমার সমাজে। এখান থেকে কেউ তোমাকে কোনদিন অজানা অন্ধকারের মাঝে ঠেলে ফেলে দিতে পারবে না।

কাজ আর চিন্তার মাঝে এমনি করে দিন কেটে যায়। কাঞ্চন-পুরীতে কত নতুন নতুন মুখের আবির্ভাব হয়। প্রথমে অন্য এক অবাক পৃথিবীর সামনে এসে তারা থমকে দাঁড়ায়, তারপর গভীর

আনন্দের মাঝে কখন ডুবে যায়। কণ্ঠে এমন সুর, দেহে এমন ছন্দ তাদের লুকিয়েছিল, এ যে তাদের কাছে বিশ্বাসেরও অতীত।

কিন্তু হঠাৎ একদিন ভেঙে গেল এই আনন্দের হাট। [illegible]টা ঝড়ের আভাস দেখা গেল দিগন্তে। দিকে দিকে যে চিতা থেকে কর্পূরমঞ্জরী তুলে নিয়ে এসেছে কন্যাদের, সেই চিতার ক্রোধাগ্নি হঠাৎ যেন ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। হিন্দু জমিদারেরা সমবেত হলেন এই ধর্মদ্রোহিতাকে প্রতিরোধ করতে। বিদ্যুতের মত খবর এসে পৌঁছল কাঞ্চনপুরীতে।

নূপুর নীরব হয়ে গেল, সমে না পৌঁছতেই সংগীত গেল থেমে। আলোচনা সভা বসল। স্থির হল, পালাতে হবে—যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। নইলে সমস্ত সাধনাই তাদের সমাধি লাভ করবে। এত প্রচেষ্টার শেষ পরিণতি হবে অগ্নিদাহে।

পয়গল খাঁ কয়েকটি উট আনালেন। কাঞ্চনপুরীর কন্যাদের জন্য তৈরি হল বোরখা। বোরখায় গা ঢেকে তারা চলল আগ্রার পথে। সঙ্গে রইল রক্ষীর দল। পথে ঘোষক ঘোষণা করতে করতে চলল, বাংলার সুবাদার দিল্লীর হারেমের জন্য পাঠাচ্ছেন এই সব উপঢৌকন।

পথে কোন বিঘ্ন ঘটল না। সমস্ত দলটি নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেল বাংলা দেশের সীমানা।

কর্পূরমঞ্জরী নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলল। কিন্তু বিপদমুক্তিতে যেমন সকলে স্বস্তিবোধ করল, তেমনি অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তারা কোন আলোর সন্ধান পেল না।

কাঞ্চনপুরী ছেড়ে আসবার দিন খাঁ সাহেব কর্পূরমঞ্জরীকে একান্তে ডেকে একটি পত্র দিয়েছিলেন। আগ্রা পৌঁছে পত্রটি দিতে হবে নূরজাহানের হাতে। খাঁ সাহেব সেই পত্রে তাঁর শিষ্যার কাছে এই অসহায় মেয়েগুলির জন্য একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

কত পথ কত প্রান্তর তারা পার হল। অবশেষে একদিন এসে পৌঁছল মোগল বাদশার বিলাসনগরী আগ্রায়।

ছয়

আগ্রা শহরের নাম তখন আগ্রা নয়—আকবরাবাদ। বাদশাহ আকবর তাঁর মনের মত করে সাজিয়েছিলেন আগ্রা নগরী। দুর্গবেষ্টিত প্রাসাদ আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ায় যেন জেগে উঠেছে। যমুনা বয়ে চলেছে সেই প্রাসাদের অনতিদূরে। ইতস্ততঃ অগণিত পথঘাট, মিনার, মসজিদ, মনোরম বাগিচার মাঝখানে সুদৃশ্য অট্টালিকা। আমীর ওমরাহেরা সেখানে বসবাস করেন। আগ্রার ভেতরে আর বাহিরে বিস্তর দোকানপাট। দিবারাত্রি বিভিন্ন কাজকর্মে লোকজনের আনাগোনা কোলাহল।

উটের পিঠে চেপে কর্পূরমঞ্জরী তার দলবল নিয়ে আগ্রায় এসে ঢুকল। পল্লীবাংলার মেয়ে তারা। শহরের সঙ্গে একেবারেই পরিচয় ছিল না। আগ্রা শহর, তার বাড়ীঘর, লোকজন দেখে তারা রীতিমত অবাক হয়ে গেল। কোথাও বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে অতিকায় একটি হাতি শুড় দুলিয়ে চলেছে, হাতির ওপরে মাহুত আর হাওদার ওপরে রাজপুরুষ। অশ্বারোহী পুরুষেরা এপথে ওপথে আসা-যাওয়া করছে। হঠাৎ একটা হুম্-হুম্ আওয়াজ শুনতে পেল তারা। রাস্তার একটা গলিপথ থেকে আওয়াজটা ভেসে আসছিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই তাদের সামনে এসে পড়ল একদল বিচিত্র পোশাক-পরা লোক। হাত ইশারায় পথ থেকে তারা সবাইকে সরে যেতে বলল। কর্পূরমঞ্জরীর দল পথের একেবারে ধারে সরে এল। ইতিমধ্যে আর একদল লোক গলির মোড় পেরিয়ে এসেছে। তাদের হাতে ময়ূরের পাখা। পাখাগুলো তারা শূন্যে নেড়ে চলেছে।

উটের চালকেরা বলল, কোন ওমরাহ আসছেন পালকিতে চেপে। তাঁর জন্যে এই আয়োজন। এসে পড়লেন ওমরাহ

পালকিতে চেপে। সুসজ্জিত পালকি। রুপো আর সোনার ঝালর ঝুলছে পালকিতে। পালকির সামনে একদল অশ্বারোহী সৈন্য, পেছনেও তাই। পালকির সঙ্গে সঙ্গে দু'পাশে চলেছে সুসজ্জিত নফরের দল। কারু হাতে পিকদানী, কারু হাতে বা পানীয় জলের কুঁজো, খাবারের পাত্র।

ওমরাহ পার হয়ে চলে গেলেন। আবার পথের লোকে যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল পথের ওপর দিয়ে। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, ওরা এসে উঠল সরাইখানায়। চাল ডাল কিনে রান্নাবান্না করে খাওয়া দাওয়া শেষ করল। রাতে আর সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে দেখা করবে না কর্পূর-মঞ্জরী। সকালে যাবে সে পয়গল খাঁর পত্র নিয়ে দেখা করতে।

নূতন জায়গায় বার বার তাদের ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। কত রাত পর্যন্ত সরাইখানায় ভিড় লেগে রইল। কত দূর থেকে কতরকমের যাত্রী আসতে লাগল। কেউ এল ঘোড়ায় চড়ে, কেউ বা এল উটের পিঠে চেপে। এক সময় নীরব হয়ে গেল চারদিক। সম্ভবতঃ গভীর রাত তখন। দলের অন্যান্য মেয়েরা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু ঘুম নেই কর্পূরমঞ্জরীর চোখে। সে ভাবছে অনাগত ভবিষ্যতের কথা। কতবড় দায়িত্বের বোঝা আজ সে বয়ে নিয়ে চলেছে। এ বোঝা বইতে যেমন আছে প্রবল একটা উন্মাদনা, তেমনি আছে তীব্র দুশ্চিন্তার দাহ। সবাই তার ওপর নিজের নিজের ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছে। কেবল ভাবতে হচ্ছে তাকে। তার এ ভাবনার আর কোন একটি সঙ্গী যদি সে পেত! ভাবতে ভাবতে শেষরাতের দিকে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সে। কি একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল তার। সম্মিলিত একটা সুর দূর থেকে ভেসে আসছিল। সে শুয়ে শুয়ে তাই শুনতে লাগল। সুরের ভেতর ভৈরবীর একটা আমেজ আছে। কর্পূরমঞ্জরী অনুমান করল, ভোর হয়ে আসছে। সম্রাটের নহবৎ-খানায় সম্ভবতঃ ঐকতানে ভোরের ঘোষণা করা হচ্ছে।

প্রভাত হল। যাত্রীরা সরাইখানা ছেড়ে একে একে যে যার গন্তব্য পথে চলে গেল। কর্পূরমঞ্জরী তার দলবল নিয়ে আরও একটি দিনের জন্য সরাইখানায় থাকাই মনস্থ করল। সবাই রইল সরাইখানায়, কর্পূরমঞ্জরী চলল সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে রইল মুসলমান একটি উটচালক। কর্পূরমঞ্জরীর পরনে ছিল বাংলাদেশের একখানি সাধারণ বস্ত্র। অসাধারণ কোন সজ্জা ছিল না তার অঙ্গে; তাই প্রথমে দুর্গদ্বারেই তাকে প্রহরী আটকাল। পয়গল খাঁর পত্র দেখিয়ে সে কোনরকমে দুর্গপ্রবেশের অনুমতি পেল। তারপর বহু চেষ্টায় সে প্রবেশ করল হারেমে—নূরজাহানের মহলে। সামনে চমৎকার সাজানো বাগান। বাগানের মাঝে কৃত্রিম ঝর্ণা। বসার জন্য উঁচু বেদী। বেদীর ওপরে চন্দ্রাতপ, আর তার চারদিক ঘিরে ছায়ালতা। অজস্র বিচিত্র বর্ণের ফুলে ছেয়ে আছে সেই লতাকুঞ্জ। একটি সুদৃশ্য তোরণ পেরিয়ে খোজা প্রহরীর সঙ্গে নূরজাহানের মহলে ঢুকলো কর্পূরমঞ্জরী। লাল-পাথরের মেঝের ওপর দামী গালিচা পাতা। ঘরের চারদিকের দেওয়ালে বিচিত্র নক্শা, ওপরে চন্দ্রাতপ। সোনার ঝালর তার চারদিক ঘিরে। সেজের বাতিদান ঝুলছে সেই চন্দ্রাতপের কেন্দ্র থেকে। সম্রাজ্ঞীর পায়ের কাছে বসে আছে দুটি পরিচারিকা। অন্য একজন ময়ূরপাখা নিয়ে ব্যজন করছে দাঁড়িয়ে, নূরজাহানের হাতে একটি সুদৃশ্য গোলাপ!

পয়গল খাঁর পত্রখানা আগেই সম্রাজ্ঞীর হাতে পৌঁছেছিল। কর্পূরমঞ্জরী ঘরে ঢুকতেই সহাস্যে নূরজাহান তাকে একটি কার্পেটের আসন দেখিয়ে বসতে বললেন। তারপর বাংলাদেশের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ চলল। গুরু পয়গল খাঁর শারীরিক কুশলসংবাদ নিলেন; তাঁর সংগীত সাধনার কথা জিজ্ঞেস করলেন। শেষে বললেন, খাঁ সাহেবের ইচ্ছা পূরণের জন্য আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না। কয়েকদিন নগরীর ভেতরে সরাইতে অবস্থান

করুন। তারপর আপনাদের স্থান নির্দিষ্ট হলেই আমি খবর পাঠাব।

একটা বিরাট সমস্যার সমাধান এমন সহজে হয়ে যাবে তা কিন্তু ভাবেনি কর্পূরমঞ্জরী। সে উঠে দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞতায় সম্রাজ্ঞীকে কুর্নিশ করল। অমনি হেসে নূরজাহান দুইকর যুক্ত করে বললেন, বাংলা-দেশের রীতি আমার অজানা নয়।

প্রতিনমস্কার জানিয়ে খোজার সঙ্গে জেনানামহল থেকে বেরিয়ে এল কর্পূরমঞ্জরী। তারপর দুর্গ পার হয়ে এসে পৌঁছল নির্দিষ্ট সরাইখানায়।

কাজ হল একখানি পত্রে। বাংলাদেশ থেকে যে বিপদ মাথায় তুলে নিয়ে এসেছিল কর্পূরমঞ্জরী আজ তার থেকে সে নিজেকে অনেকখানি মুক্ত বলে মনে করল। দলবল নিয়ে কয়েকদিন সে ঘুরে বেড়াল সারা আকবরাবাদ। যমুনার কূলে শান্ত সন্ধ্যায় তারা ছড়িয়ে দিল গানের সুর। একদল গগনবিহারী পারাবতের মত তাদের স্বচ্ছন্দবিহারকে নগরবাসীরা কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করতে লাগল।

কয়েকদিনের ভেতরেই সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে সুসংবাদ বহন করে লোক এসে গেল। নগরীর একপ্রান্তে তাদের জন্য আস্তানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন তারা সেখানে গিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। শুধু তাই নয়, যতকাল তারা নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হতে না পারছে সরকার থেকে তাদের সে পর্যন্ত একটা ভরণপোষণেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহান।

এর বিনিময়ে দলের নেত্রী কর্পূরমঞ্জরীকে একটি অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। সম্রাটের চিত্তবিনোদনের জন্য তাঁরা যেন মাঝে মাঝে দরবারে এসে নৃত্যগীত করে যান।

কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল কর্পূরমঞ্জরীর মন। সে সংবাদবাহীর হাতে একটি পত্র দিয়ে জানাল, সম্রাজ্ঞীর করুণা ও আদেশ তারা মাথা পেতে গ্রহণ করল।

যমুনার তীরে উত্থানবেষ্টিত নতুন বাসস্থানটি সত্যই মনোরম। উন্মুক্ত প্রান্তর থেকে হাওয়া বয়ে আসছে। সাজান উত্থানের মাঝে কৃত্রিম ফোয়ারা। নানাবর্ণের ফুলের মেলা। বাগানের মধ্যে সুদৃশ্য কতকগুলি পথ উত্থান বাটিকায় গিয়ে মিশেছে। মালি কাজ করছে। রক্ষীরা পাহারায় নিযুক্ত। এই রম্যস্থানটি বাদশাহের একটি অন্যতম উত্থান বাটিকা। সম্রাজ্ঞীর ব্যবস্থায় কর্পূরমঞ্জরীদের আবাসস্থলে পরিণত হল এই গৃহ।

নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার মাঝখানে এসে আবার তারা পায়ে বেঁধে নিল নূপুর। রেওয়াজ চলল প্রভাতে সন্ধ্যায়। কখন বাদশাহের দববার থেকে ডাক আসে। সে ডাকের যোগ্য মর্যাদা তাদের দিতে হবে। কিছু সংশয়, কিছু বা ঔৎসুক্য নিয়ে তারা প্রতীক্ষা করতে লাগল সেই দিনটির।

অভিলষিত সেই দিন আসতে দেরি হল না। সম্রাটের কাছ থেকে দরবারে যাবার ফরমান এসে গেল।

সন্ধ্যায় দরবার ঘরে আর লোক ধরে না। দুর্গদ্বার থেকে দরবার কক্ষ পর্যন্ত দীর্ঘ পথের দুইদিকের প্রাকারে বাতি জ্বলছে। বিচিত্র লতাপুষ্পের কাজ-করা দু'শাখা-বাতিদান—তার ওপর মোমের বাতি। দরবার ঘরটি এমনিতেই সুসজ্জিত। আজ আবার নবাবের আদেশে বিশিষ্ট ওমরাহেরা তদারক করে সাজিয়েছেন। দরবারে আজ টাঙান হয়েছে 'চৌবীনরৌতি।' তাঁবুর নীচে খসখসের চাল। খসখসের ওপর কিংখাব আর মলমল এঁটে দেওয়া হয়েছে। উপরে লাল সুলতানী বনাত। ঝাড়ের আলো দুলছে ওপর থেকে। বেলোয়ারীর ওপর আলো পড়ে বিচিত্র ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি হয়েছে।

সমস্ত মেঝেটি সিল্কের কাপড় দিয়ে মোড়া। যেখানে নাচ ও গানের আসর হয়েছে সেখানে মূল্যবান পারসী গালিচা পাতা, বিচিত্র নক্শার কাজ তাতে। উঁচু বেদীর ওপর সিংহাসন। সোনায় মোড়া, মূল্যবান মণিমাণিক্যখচিত। সম্রাটের সিংহাসনের নীচেই রুপোর

রেলিঙ দিয়ে ঘেরা একটি চত্বর। তার ওপর চাঁদোয়া। চাঁদোয়া থেকে ঝুলছে সোনার ঝালর। এ স্থানটি আমীর ওমারাহ্ আর রাজদূতদের জন্য নির্দিষ্ট।

তাঁরা ইতিমধ্যেই এসে গেছেন। মাথা নীচু করে বুকের ওপর দুটি হাত আড়াআড়ি ভাবে রেখে তাঁরা দাঁড়িয়ে গেছেন। দরবারের এই রীতি। বিচিত্র মীনার কাজ করা স্তম্ভগুলি থেকে ঝুলছে রেশম আর সোনার মালাবন্ধনী।

সম্রাট এসে বসলেন সিংহাসনে। সকলে মাথা নীচু করে কুর্নিশ করল। সাদা সাটিনের মেরজাই সম্রাটের গায়ে, তার ওপর রেশম আর সোনার সুতো দিয়ে কাজ করা। শিরস্ত্রাণ যে কাপড়ে তৈরি, তাতেও সোনার সূক্ষ্ম কাজ। কপালের একটু ওপরে শিরস্ত্রাণে এক সার হীরে জ্বলজ্বল করছে। মাঝখানে অতি উজ্জ্বল একটি পোখরাজ মণি বসান। মালা দুলছে সম্রাটের গলায়। নাভিদেশ পর্যন্ত প্রলম্বিত মুক্তোর মালা। সম্রাটের পাশে দাঁড়িয়ে খোজা ভৃত্যের দল। বিনয়ে অবনত। কেউ চামর নিয়ে, কেউবা ময়ূর-পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগল।

কর্পূরমঞ্জরীরা আগেই প্রাসাদে এসে একটি কক্ষে অপেক্ষা করছিল। সম্রাট তাদের ডাক পাঠালেন। কর্পূরমঞ্জরীদের এ ধরনের সম্মানের পেছনে অবশ্য ছিল নূরজাহানের গুরুভক্তি।

সমুদ্রের বেলাভূমিতে যেমন চাপ রচনা করে ফেনার ফুল ফুটিয়ে তরঙ্গ এগিয়ে আসে, তেমনি চঞ্চল চরণে কুর্নিশ করতে করতে এগিয়ে এল নর্তকীর দল।

তারপর আবার পায়ে পায়ে পিছিয়ে গেল তারা। সামনে রইল শুধু একটি নর্তকী। যেন একটি কলহংস নিঃসঙ্গ হয়ে উঠে আসছে নির্জন সমুদ্র তীরে। শুরু হল নৃত্য। বিশিষ্ট দেহমুদ্রায় উত্তাল তরঙ্গ যেন ওঠানামা করছে। বিচিত্র দোলায় দুলে দুলে উঠছে নর্তকীর অঙ্গ। ঢেউ উঠে আসছে কটিদেশ থেকে, বক্ষদেশ

প্লাবিত করে বয়ে-চলে যাচ্ছে বাহু, মণিবন্ধ পেরিয়ে করাঙ্গুলির শেষ প্রান্তে। ঝাড়ের আলো এসে পড়েছে। আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে সারা দেহ। গড়িয়ে পড়ছে অঙ্গের লাবণ্য। হঠাৎ নূপুরের লীলায় কলধ্বনি তুলে শেষ তরঙ্গের দোলায় সে নিমেষে এসে লুটিয়ে পড়ল তীরভূমিতে। বিস্তারিত বাহু যুক্ত হল, গ্রীবাশীর্ষ আনত হল। ভারত নাট্যমের বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় মুগ্ধ জনতাকে নমস্কার নিবেদন করল কর্পূরমঞ্জরী।

বাদশাহ উচ্ছ্বসিত সাধুবাদে অভিনন্দিত করলেন নর্তকীকে। খোজার হাতের স্বর্ণথালিকা থেকে কয়েকটি মোহর তুলে নিয়ে ফেলে দিলেন মঞ্চের ওপর। চারদিকে ওমারহ ও দর্শকেরা কেরামৎ, কেরামৎ ধ্বনি করে বাদশাহের কাজের তারিফ করতে লাগল। রঙ ধরল একটি চোখে। সে চোখের রঙ শিরা উপশিরার নালীপথ বেয়ে গড়িয়ে এল হৃদয়সমুদ্রে। রঙে রঙে রঙীন হয়ে গেল হৃদয়। সে হৃদয়ের অধিস্বামী দিলীপ সিংহ ভাবতে লাগলেন, কবে এই নর্তকীশ্রেষ্ঠাকে লীলাসঙ্গিনী করে জীবনটাকে তিনি ধন্য মনে করবেন।

একের পর এক নৃত্য আর গীত চলল কতক্ষণ। ক্ষণে ক্ষণে জনতার সাধুবাদে দরবার কক্ষ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

কত্থক নৃত্যে শেষ হবে অনুষ্ঠান। শুরু করেছিল কর্পূরমঞ্জরী, এখন শেষ করতে এগিয়ে এল সখী কাদম্বিনী।

নিঃস্তব্ধ সভাগৃহ। কোথা থেকে ভেসে এল একটা বাঁশির সুর। সঙ্গে সঙ্গে ত্রস্ত চরণে এগিয়ে এলেন শ্রীমতী রাধা। বাঁশির সুর শুনে ভুল হয়ে যাচ্ছে তাঁর গৃহকাজে। ইতস্ততঃ খুঁজে ফিরছেন সেই মোহন মুরলিয়াকে। কখনও ত্রস্ত, কখনও স্থির তাঁর গতিভঙ্গী। কর প্রসারিত করছেন যমুনার কূলের দিকে।

ঐ যমুনার তীর থেকেই বুঝি ভেসে আসে বাঁশির সুর। তাঁকে যেতে হবে—সব কাজ ফেলে তিনি যাবেন সেই বংশীবাদকের কাছে।

তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ হরণ করে নিল যে সেই নয়নভোলানকে তিনি দেখবেন নয়ন মন পূর্ণ করে। অদৃশ্য এক আকর্ষণে আকুল হয়ে উঠেছে নর্তকী। তার প্রতিটি মুদ্রায় সেই আকুলতার কি দুর্বার আবেদন।

কিন্তু শ্রীমতীর ঘরে গুরুজনের ভয়। সমস্ত প্রাণ চাইছে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হতে, কিন্তু ঘরে তাকে শত চোখের শাসন বেঁধে রেখেছে। দেহ নিয়ে শ্রীমতী যমুনার কূলে তাই যেতে পারছেন না, কিন্তু মন স্থির থাকবে কি করে। গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে শ্রীমতীর মন। সেই অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ছে তাঁর চরণে। যমুনার কূলে যাবার বাসনা তাঁর স্থির চরণকে চঞ্চল করে তুলেছে। একই ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীমতী রাধা, কিন্তু তাঁর চরণের মঞ্জীর মুখর হয়ে উঠেছে। গৃহদ্বারে দাঁড়িয়েই তিনি যমুনার কূলে যাত্রা করছেন। কি অস্থিরতা চরণে, কি ত্রস্তধ্বনি নূপুরের! বাদ্যযন্ত্রে সংগতদার তরঙ্গ তুলছেন, তাকে ছাপিয়ে মঞ্জীরের ধ্বনি উঠছে নর্তকীর চঞ্চল চরণে।

সমে এসে এক সময় সহসা থেমে গেল নূপুর, থেমে গেল সঙ্গত। কিন্তু স্তব্ধ সভাগৃহ সহসা ভেঙ্গে পড়ল উচ্ছ্বসিত কলরবে।

কাদম্বিনীও মোহর কুড়াল। বাদশাহকে কুর্নিশ করতে করতে সে গিয়ে প্রবেশ করল সজ্জাকক্ষে।

দ্বিতীয় আর একটি মন কাঁপল। আশ্চর্য হলেন বার্নার্ড-সাহেব নিজের দিকে তাকিয়ে। যে মন কোনদিন সংসারের বাঁধনে ধরা দেয়নি সে মন সহসা ক্লান্তি অনুভব করল। সপ্তসিন্ধু পার হয়ে, দুস্তর মরুর ওপর দিয়ে যিনি নিরন্তর জীবনকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছেন, হঠাৎ তাঁর গতিভঙ্গ হল। বাদশাহের প্রিয়পাত্র চিকিৎসক বার্নার্ড স্বপ্ন দেখলেন, একটি ছোট নীড়, কোন এক নদীর কূলে। সেখানে এতদিনের নিঃসঙ্গ জীবনের একটি মাত্র সঙ্গী। সে কে! এই আশ্চর্য নর্তকী কাদম্বিনী।

সেদিন আগ্রাবাসীদের সাধুবাদের ভেতর শেষ হল অনুষ্ঠান। কাঞ্চনবালারা ফিরে গেল নিজেদের আস্তানায়। তাদের মন ভরে উঠেছে তৃপ্তিতে। স্বয়ং বাদশাহকে তারা তুষ্ট করতে পেরেছে তাদের নৃত্যগীত পরিবেশন করে। সার্থক হয়েছে তাদের শিক্ষা। কিন্তু তারা যে আনন্দের তরঙ্গ তুলে এল মোগল দরবারে, তার আঘাত গিয়ে লাগল দুটি হৃদয়ের তটে। তাদের প্রথম জন হলেন দিলীপ সিংহ, দেশীয় নৃপতি। আর অন্যজন ফরাসী দেশবাসী ডাক্তার বার্নার্ড।

এক পুণ্যতিথি ছিল সেদিন। কর্পূরমঞ্জরী সদলে যমুনায় স্নান করতে চলল।

আগ্রার রাজপথ আলো করে চলল তারা উটের পিঠে চেপে। যে প্রাণগুলি বীভৎস মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা হারাতে বসেছিল, নূতন জীবনের আবেগে তারা আজ আগ্রার ঐশ্বর্যময় রাজপথকে চঞ্চল করে তুলছে ক্ষণে ক্ষণে। তাদের দেখে আজ নগরবাসীরা অন্তরের গভীর উল্লাস প্রকাশ করছে। তাদের নৃত্য আর গীতে সারা আগ্রা শহর আজ মুখরিত। ওদের আর একটা জীবন বাংলার কোন কোণে কত পেছনে পড়ে রইল, সে হিসাব আজ ওদের কাছে অবান্তর। আজ ওরা পৃথিবীতে বাঁচবার ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছে, জীবনের মূল্য বুঝতে পেরেছে। বাঁচবার নিত্য নূতন আস্বাদে এখন প্রতি মুহূর্তে ভরে উঠছে ওদের প্রাণ। বেঁচে থাকবার এত আনন্দ আর এত তৃপ্তি যেন ওদের চোখে নতুন করে ধরা দিয়েছে। তাই পেছনের কোন দুঃখ ওদের পীড়া দিতে পারছে না। হাসি তামাসার মধ্যে কতক্ষণ কাটিয়ে এক সময় তারা এসে গেল নদীতীরের বাঁধান ঘাটে। পায়ের নীচেই এবার যমুনার নীল জলধারা। কী স্বচ্ছ, কেমন শান্ত আর কত স্নিগ্ধ! পরিপূর্ণ আনন্দের মত জল টলমল করছে।

কী পরম কামনার ধন যেন সে ভরা জলের আড়ালে লুকিয়ে আছে। নেমে পড়লেই তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে বুঝি।

যমুনার পুণ্য তীরভূমিতে এসে কাঞ্চনবালার দল মনের ভেতর কেমন এক আনন্দের আহ্বান শুনতে পেল যেন। দেরি আর সইছে না। অধীর হয়ে এক সঙ্গে তারা দ্রুত নেমে পড়লো ঘাটের বাঁধানো চাতালে। তারপর মসৃণ সিঁড়ির ধাপে ধাপে চঞ্চল পায়ের শব্দ তুলে এক ঝাঁক হাঁসের মত ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

গ্রামবাংলার সেই অতি পরিচিত ঝোপ ঝাড় ঘেরা সংকীর্ণ কোন অগভীর, পুষ্করিণীর জলে নির্জন দুপুরে যেমন কচি বয়সের মেয়েরা দুরন্তপনায় অস্থির হয়ে ওঠে, এই সুদূর উত্তর ভারতের একান্তে দূরবিস্তৃত যমুনার বুকে ওদের সেই হারানো শৈশবটা আজ ছাড়া পেয়ে গেল হঠাৎ। জলের কোলে গা ঢেলে দিয়ে সেদিনের মত আজও ওদের যেন আর আশ মিটতে চাইল না।

এমনি কাটলো কতক্ষণ। আরো কতক্ষণ যে কাটতো কে জানে। কিন্তু দূরের দিকচক্রবাল কিসের আবির্ভাবে যেন হঠাৎ ঘন হয়ে উঠল। স্নানের ঘাটে দাঁড়িয়েই সবার দৃষ্টি পড়ল সেইদিকে। কিন্তু কেউ কিছুই বুঝতে পারল না। দেখতে দেখতে আকাশ বাতাস থমথমিয়ে এলো। এতক্ষণের উচ্ছল যমুনাও কেমন সহসা গম্ভীর হয়ে গেল অথচ মাথার ওপরে আকাশ পরিষ্কার। পথের ওপর থেকে অপেক্ষারত উটের চালকদের কোলাহল শোনা গেল,—ঝড়, ঝড়, আঁধি, সামাল সামাল!

যমুনার জলের মত মুহূর্তে কাঞ্চনবালাদের মুখ আতঙ্কে কালো হয়ে উঠলো। ঝড় আসছে, প্রবল ঝড়, আঁধি। এ বাংলাদেশের বৃষ্টি বাতাস ও স্নিগ্ধ সজল ঝড় নয়। রুক্ষ অনুর্বর অঞ্চলের বুক ঝাঁটিয়ে শুকনো ধুলো কাঁকরের ঝাপটাওড়া প্রবল ঘূর্ণি। নিদারুণ ভয়াবহ এই দুঃসহ ঘূর্ণি হাওয়ার বেগ। নির্মল দিন দুপুরেও এই দুরন্ত ঝড়ের আঁধি হঠাৎ প্রবল বিক্রমে গ্রাস করে ফেলে সমস্ত

অঞ্চলকে। মুহূর্তে শোচনীয় বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে সমস্ত কিছু যেন ওলটপালট করে দিয়ে যায়। বাংলা দেশের মানুষ এ ঝড়ের পরিচয় পায়নি আগে। তাই দিগন্ত থেকে কোন অঘটনের সম্ভাবনায় কর্পূরমঞ্জরীর দল হতচকিত হয়ে গেল। কালো হয়ে উঠে আসছে ঝড়। চারপাশে তাই একটা ত্রস্ততার সাড়া পড়ে গেছে। আসন্ন বিপর্যয়ের আভাস জলেস্থলে যেন খবর রটিয়ে চলেছে। তার পেছনে পেছনে অন্ধ একটা দৈত্যের মত প্রবল বেগে ধাওয়া করে ছুটে আসছে ধূলির ঝড়। জলের বুকে দাঁড়িয়ে থাকতে আর কেউ সাহস পেল না। ভীষণ ভয় পেয়ে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে সিক্ত বস্ত্রে দৌড়ে পালিয়ে আসতে লাগলো সবাই।

কিন্তু পালাবে কোথায়? ওপরে উঠে আসতে না আসতেই ঝড়ের দৈত্যটা ছুটে এসে ওদের নাগাল ধরে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক একেবারে অন্ধকার। প্রচণ্ড দমকা হাওয়ার বেগে ধুলো-বালির রাশ উড়তে লাগলো। তার ঝাপটা এসে লাগলো সকলের চোখে মুখে। ঝড়ের মুখে পড়ে এদের যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। দিক্-বিদিক্‌জ্ঞানশূন্যের মত তখন যে যেদিকে পারলো দৌড়ে চলল। যে কোন রকমে একটা আশ্রয় তখন তাদের লক্ষ্য। কতক্ষণ যে তারা এমনি দৌড়ে চলল, খেয়াল ছিল না। কিন্তু হঠাৎ এক সময় কাদম্বিনী টের পেল, সে একেবারে একলা পড়ে গেছে এই ঝড়ের মধ্যে। যথাসাধ্য একবার চোখমেলে সে দেখে নিল কিন্তু না, তার সঙ্গিনীরা আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। বুঝতে দেরি হলো না, পাগলের মত ছুটতে গিয়ে সে দলছাড়া হয়ে পড়েছে। কিন্তু কোন্ পথে কতদূরে কোথায় যে সে এসে পড়েছে তা আর সে বুঝতে পারল না। যতদূর মনে হলো, তার চারদিকে আবছা ফাঁকা একটা প্রান্তর ঘিরে আছে।

ঝড়ের মুখে যেতে যেতে মাটিতে সম্পূর্ণ লুটিয়ে পড়বার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কোথায় যেন ঘোড়ার খুরের একটা শব্দ সে শুনতে পেল।

কেউ যেন সজোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। থেকে থেকে শব্দটা যেন তার কাছাকাছি আসছে বলে মনে হল। ঘোড়ার শব্দ অনুমান করে দিক ঠিক করার আগেই কিন্তু ছায়ার মত এক অশ্বারোহী পুরুষ তার পাশে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন হঠাৎ। অপ্রত্যাশিত ঝড়ের মুখে পড়ে কাদম্বিনী বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ শূন্য প্রান্তরের মাঝখানে আগন্তুককে দেখে সে খানিকটা আশান্বিত হয়ে উঠল। ঘোড়া থেকে নামলেন অশ্বারোহী পুরুষ। তারপর বিনা দ্বিধায় কাদম্বিনীর হাত ধরে তাকে ঘোড়ার ওপর টেনে তুললেন। আকস্মিক পুরুষ স্পর্শে কাদম্বিনীর নারীদেহ কেমন এক শিহরণ অনুভব করল। কিন্তু কোন কিছু চিন্তা করবার মত শক্তি সে তখন হারিয়েছে। এই প্রবল দুর্যোগের মাঝখানে নারীত্বের সমস্ত লজ্জা সংকোচ তার মন থেকে তখন লোপ পেয়ে গেছে। নির্বিবাদে নিজেকে একটি পুরুষের সান্নিধ্যে সমর্পণ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়াটি দৌড়াতে শুরু করে দিল দুটি নরনারীকে পিঠে নিয়ে। চোখ বন্ধ করে নির্জীবের মত ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে লাগলো কাদম্বিনী।

আবার যখন সে চোখ খুললো, ঘোড়াটা তখন এক জায়গায় এসে থেমে গেছে। সামনেই ছোটখাট বাড়ীর মত কি যেন একটা অস্পষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভালো করে সেটা ঠাহর করতে পারলো না কাদম্বিনী। কিন্তু সেটা যাই হোক না কেন, এই দুর্যোগে সেখানে হয়ত নিরাপদ আশ্রয় একটু মিলবে। নামলেন অশ্বারোহী। হাত ধরে নামালেন কাদম্বিনীকে, তারপর দুজনে ঢুকে পড়লেন একটা পড়ো ঘরের ভেতর।

কে জানে, আরো কতক্ষণ সে ঝড় চলেছিল। ঘরটার মধ্যেও ঝড়ের ঘোর অন্ধকার। তার মাঝখানে শূন্য মেঝের একপাশে নিঃসাড়ে অনেকক্ষণ পড়ে রইল কাদম্বিনী। দারুণ ক্লান্তিতে সঙ্গের পুরুষটির প্রতিও সে মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছিল সেই মুহূর্তে।

অনেকক্ষণ দাপাদাপি আর এলোমেলো মত্ততার পর ঝড় যখন শান্ত হয়ে এলো, কাদম্বিনী যেন একটু একটু করে প্রাণ ফিরে পেল। চারপাশ ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে এল। নির্মল হয়ে উঠল ধূসর আকাশ। দিন শেষ হতে তখনো ঢের দেরি। একটা দুঃস্বপ্ন মিলিয়ে গিয়ে আবার কখন যেন চারদিকের জীবন সহজ হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করল। আশ্বস্ত হয়ে কাদম্বিনী মুখ তুলল। এতক্ষণে সে টের পেল, যেখানে তারা এই ঝড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে, সেটা একটা পুরানো মসজিদ। কিন্তু তার কাছে সবটাই অপরিচিত। মসজিদের বাইরের এই নতুন জায়গাটাকেও সে আদৌ চেনে না। নাই বা সে চিনলো। তবু তো একজন বিপদের সঙ্গী আছে তার। কথাটা ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের মধ্যে একটা ভরসা খুঁজে পেল কাদম্বিনী। কিন্তু কোথায় সে পুরুষ? ঝড় থামার সঙ্গে সঙ্গে সেও তার পাশ থেকে সরে যায়নি তো? দু চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ মেলে দিয়ে অজ্ঞাত, অপরিচিত সেই লোকটিকে পরম বান্ধবের মত চারপাশে খুঁজতে গিয়ে পরমুহূর্তে অবাক হয়ে গেল কাদম্বিনী। মসজিদের একপাশে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে যে দীর্ঘকায় মানুষটি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি কাদম্বিনীর কাছে একেবারে অচেনা নন। মোগল দরবারের অজস্র সপ্রশংস দৃষ্টির মাঝখান থেকে যাঁর দৃষ্টির অভিনন্দন বার বার পৃথক হয়ে ধরা পড়তো তার কাছে, আজ সেই মানুষটি যে এমন করে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াবেন তা এর আগে কি জানতো কাদম্বিনী! সে এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে যেমন বিস্মিত হল, তেমনি মনে মনে কেমন যেন এক রোমাঞ্চ অনুভব করল।

একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন ডাক্তার বার্নার্ড। কাদম্বিনীকে লক্ষ্য করছিলেন তিনি, আর ভাবছিলেন লীলাময় যিশুর অপার মহিমার কথা। যে মেয়েটি প্রথমদিনে নাচের আসরে তার ভবঘুরে অশান্ত মনটাকে শান্ত করে দিয়েছিল, যার চিন্তা আজ তাঁর সারা

মন জুড়ে, এই নিভৃত মসজিদে তাকে একান্তে পেয়ে বার্নার্ড সাহেব নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করতে লাগলেন। কাদম্বিনী স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে দেখে বার্নার্ড তার কাছে এগিয়ে এলেন। হেসে বললেন, আঁধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। এমন আঁধি সচরাচর দেখা যায় না।

কাদম্বিনী বার্নার্ডের মুখের ওপর কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি মেলে দিয়ে বলল, আপনার দয়ায় আজ প্রাণ পেলাম।

বার্নার্ড বললেন, তোমার নাচ আমাকে মুগ্ধ করেছিল, তার বিনিময়ে আমার মত নিঃস্ব তোমাকে কিই বা দিতে পারত। আজ যিশু আমার হাত দিয়ে তোমার কাছে তোমার প্রাপ্য পুরস্কারটুকুই পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ আমার খুশির ঋণশোধ।

আশ্চর্য সুন্দর কথাগুলি সাহেব বলে গেলেন। কাদম্বিনী আর একবার মুগ্ধ হল সাহেবের আচরণে। সে অমনি বলল, ঋণ আজ আমিই করলাম সাহেব।

বার্নার্ড হেসে বললেন, ঋণ যদি তুমি করে থাক তাহলে তার শোধ আমি নেব একদিন। এখন তোমার ঋণ বাড়তে থাকুক।

কথাটার ভেতর অস্পষ্ট কি যেন এক আকর্ষণ ছিল। কাদম্বিনী সেই অদৃশ্য আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল। কিন্তু সেই আকর্ষণের প্রকৃতিকে সে বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করল না তখন।

সে-ও হেসে প্রত্যুত্তরে বলল, ঋণ যদি বেড়েই যায় সাহেব, তাহলে আমার শোধ করার শক্তিও যে কমে আসবে। তখন একদিন দেখা যাবে আমি দেউলে হয়ে গেছি।

বার্নার্ড হঠাৎ বলে বসলেন, তখন ঋণীকে ঘরে এনে বন্দী করে রাখা ছাড়া উপায় কি।

কিসের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠল সহসা! কাদম্বিনী মনে মনে চমকে উঠল।

বার্নার্ডের এই কথাগুলি মনে রাখবার, না মন থেকে সরিয়ে

দেবার তা সে বুঝতে পারল না। কিন্তু এর ভেতর থেকে সে একটা উত্তেজনা অনুভব করল। সারা দেহটা তার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

সঙ্কোচে কাদম্বিনী বার্নার্ডের কথার উত্তর না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে বলল, আপনার দেশ কোথা জানতে কৌতূহল হচ্ছে সাহেব!

ফ্রান্স আমার জন্মভূমি, বললেন বার্নার্ড, তবে দেশ আমার সারা দুনিয়া জুড়ে।

বার্নার্ডের কথায় কেমন যেন দূরের একটা আশ্চর্য যাদু ছিল। কাদম্বিনী সেই সূত্র ধরে হেসে বলল, সারা দুনিয়া আপনার দেশ, সে কেমনধারা সাহেব?

হঠাৎ যেন বার্নার্ড তাঁর হৃদয়ের দ্বারে কোন অনাগতার করাঘাত শুনতে পেলেন।

বার্নার্ড বলতে লাগলেন তাঁর জীবনের কথা।

সুদূর ফ্রান্স দেশ জন্মভূমি তাঁর। সেই ফ্রান্স ছেড়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন একদিন পৃথিবী দেখবেন বলে। যেমন করে পাখা মেলে পাখি সীমাহীন দিগন্তে উড়ে যায়, তেমনি সহায় সম্বলহীন বার্নার্ড দিগন্তের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন। কত সমুদ্র তিনি পার হলেন। সাগর-পাখিদের খুশির কত অভিনন্দন কুড়ালেন সাগরে সাগরে। আবার ধুধু মরুপ্রান্তরে বুকফাটা পিপাসার দাহ সহ্য করতে হল তাঁকে। এমনি করে কত নদ, নদী, নগরী, সমুদ্র, মরুস্থলী পার হয়ে এলেন তিনি সুদূর ভারত ভূমিতে। কিন্তু দিগন্ত যেমন দূরে তেমনি দূরেই রয়ে গেল। অধরাকে ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে গেলেন বার্ণার্ড সাহেব। কথার মাঝে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থেকে আবার বলতে লাগলেন বার্নার্ড। আজ আর তাঁর সেই সুদূরের স্বপ্ন নেই। এখন তিনি সীমার কামনা করছেন। একটি ছোট্ট ঘর, তার বেশী কিছু নয়। আর দুটি প্রসন্ন চোখের মায়াভরা দৃষ্টি।

মনের আবেগে বার্নার্ড বলে চললেন তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির কথা। সূর্যাস্ত হয়ে গেল। আর একটি নারীর মনে লাগল অস্ত সূর্যের সেই রক্তিম আভা। এই ভবঘুরে মানুষটির ওপর সহসা কেমন এক মায়ায় ভরে গেল তার সারা মন।

সন্ধ্যা হয়ে এল। সঙ্গিনীদের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল কাদম্বিনী।

ফেরার পথে সঙ্কোচে কাদম্বিনী আর সাহেবের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যেতে চাইল না। অগত্যা পায়ে হেঁটেই তারা ফিরল তাদের আস্তানায়। পরস্পর বিদায় নিল নগরীর পথে। কিন্তু সেদিন বিদেশী এক ভ্রাম্যমাণের সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেল বাংলাদেশের একটি ভাগ্যবিড়ম্বিতা মেয়ের হৃদয়।

মোগল দরবারে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। সেদিনও তেমনি এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কিছুদিন আগে রাজপ্রাসাদের হারেমে সম্রাটের এক প্রিয় বেগম অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই অসুস্থতা ক্রমে ক্রমে দুরারোগ্য ব্যাধির আকার ধারণ করে। বেগমের জন্য চিন্তিত হয়ে ওঠেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। এই প্রিয় বেগমটিকে সুস্থ করে তোলার জন্য তিনি কোন চেষ্টারই ত্রুটি রাখেননি। যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা চলে। রাজধানীর সেরা হাকিমের দল বেগমের চিকিৎসায় নিযুক্ত হন। তাঁদের সকল প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও রোগ উপশমের কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

হঠাৎ সম্রাটের মনে পড়ে গেল বার্নার্ড সাহেবকে। বিদেশী হলেও নতুন ইউরোপীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে অল্পদিনেই বার্নার্ড রাজধানীর মধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর খ্যাতির কথা সম্রাটের কানেও এসে পৌঁছেছিল। হাকিমদের সব চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হল তখন এই বিদেশী চিকিৎসককে দিয়ে একবার শেষ

চেষ্টা করার কথা সম্রাটের মনে হলো। ডাক পড়ল বার্নার্ড সাহেবের।

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে সাহেব বুঝতে পারলেন রোগিণীর প্রায় শেষ অবস্থা। তাই সম্রাটের প্রস্তাবে রাজী হতে প্রথমে তিনি খানিকটা ইতস্ততঃ করলেন, কিন্তু চিকিৎসকের দুঃসাহসের কাছে সে সংকোচ বেশীক্ষণ টিকলো না। তাছাড়া এই সুযোগে তাঁর সমস্ত বিদ্যা ও সুখ্যাতির আর একবার পরীক্ষাও হয়ে যাবে। হয়তো তাতে ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের গৌরবই বাড়বে নতুন করে। তাই আত্মবিশ্বাসে ভর করে রোগিণীর চিকিৎসার ভার নিতে রাজী হয়ে গেলেন বার্নার্ড সাহেব।

সে এক বিচিত্র লোক এই মোগল হারেম। স্বয়ং সম্রাট ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় পুরুষের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। রোগ-ব্যাধির সময় চিকিৎসকেরাই শুধু সেখানে প্রবেশ করতে পারেন সম্রাটের হুকুমে ; তাও আবার সম্পূর্ণ ভাবে চক্ষুবদ্ধ অবস্থায়। বার্নার্ডের ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হল না। সম্রাটের হুকুমে দামী একটা কাশ্মিরী শাল নিয়ে হাজির হলো জনৈক খোজা ভৃত্য। সেই শালে ঢেকে দেওয়া হল বার্ণার্ডের সারা দেহ। তারপর চিকিৎসক বার্নার্ড খোজার হাত ধরে হারেমের অসংখ্য বাধানিষেধ পার হয়ে এলেন রোগিণীর কাছে। সম্রাটও সঙ্গে রইলেন।

অল্পদিনেই কিন্তু আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখালেন সাহেব। তাঁর প্রাণপণ চেষ্টায় রোগিণী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল।

প্রিয় বেগমটিকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে পেয়ে সম্রাট বিশেষ প্রসন্ন হয়ে উঠলেন বার্নার্ড সাহেবের ওপর। সমস্ত রাজধানী জুড়ে সাহেবের এই অসামান্য কৃতিত্বের কথা সগৌরবে প্রচার করা হল। সম্রাট জাহাঙ্গীর অকৃতজ্ঞ নন। তিনি কেবল সাহেবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হলেন না ; তাঁকে প্রকাশ্য দরবারে নাগরিকদের সামনে বিশেষ ভাবে অভিনন্দন দানের ব্যবস্থাও করলেন।

সেই উপলক্ষে তিনি ডাক পাঠালেন কাঞ্চনবালাদের। আজকার এই অনুষ্ঠান নৃত্য-গীতে প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠবে, সম্রাটের এই অভিলাষ।

আড়ম্বরপূর্ণ রাজ-দরবারে নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশ করলো কাঞ্চনবালার দল। যথারীতি অভিবাদন জানালো সিংহাসনে উপবিষ্ট সম্রাট আর সমাগত জনসমাজকে। তারপর শুরু হল নৃত্য-গীত।

মধুর সুরতরঙ্গ জলবলয়ের মত কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে। তারপর শুরু হল নৃত্য। কাঞ্চনবালাদের দলের শ্রেষ্ঠা নর্তকী কাদম্বিনী আজ একাই নাচলো।

বার্নার্ড সাহেবকে অভিনন্দিত করার ভার যেন সে আজ নিজের ওপরেই নিয়েছিল। মুগ্ধ আবেশে বার্নার্ড দেখলেন এই কলাবতী নারীর প্রতিটি অঙ্গের আশ্চর্য ব্যঞ্জনা।

নৃত্যের লীলায় নর্তকী একবার এগিয়ে আসছে। যেন সে তার সমস্ত কিছু আজ সমর্পণ করে দিতে চায় আকাঙ্ক্ষিতের চরণে। কি আকূতি তার প্রতিটি মুদ্রায়! আবার সরে যাচ্ছে দূরে। যেন দারুণ অভিমানে সে ফিরে যাচ্ছে দয়িতের কাছ থেকে।

নূপুরের শেষ ঝঙ্কারটুকু থামবার পর মন্ত্রমুগ্ধ সভার এক প্রান্তে উচ্চ সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। রাজোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে এই আয়োজনের বিশেষ উদ্দেশ্য নিজমুখেই তিনি ঘোষণা করে বললেন, আজ এই বিশেষ দিনে আমি চিকিৎসক বার্নার্ডকে পুরস্কৃত করতে চাই।

সম্রাটের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দরবারে কেরামৎ কেরামৎ ধ্বনি উঠল।

সকলের সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে আসন ছেড়ে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন বার্নার্ড সাহেব। সশ্রদ্ধ বিনয়ে মাথা নত করে বললেন, এই গৌরব শুধু তাঁর একার প্রাপ্য নয়, সমগ্র ইউরোপই গৌরব লাভ করলো সুদূর এশিয়ার এক মহান দেশ এই ভারত ভূমির

রাজ-দরবার থেকে। সম্রাটের অশেষ অনুগ্রহ লাভ করে আমি ধন্য হয়েছি। তাঁর এই অনুষ্ঠানের আয়োজনই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। একটু থামলেন বার্নার্ড। সভার বিশেষ একদিকে মুহূর্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কি যেন দেখবার চেষ্টা করলেন। তারপর নম্র বিনয়ে বললেন, মহানুভব সম্রাটের এই অকৃপণ প্রশংসাই আমার যোগ্য পুরস্কার। তবু যখন তিনি প্রতিদানে আমাকে পুরস্কৃত করতে চান তখন আমি নিজেকে বিশেষ সৌভাগ্যবান বলেই মনে করছি। কিন্তু এবিষয়ে আমার সামান্য একটি আবেদন আছে। সম্রাটের পুরস্কার যখন আমারই প্রাপ্য, তখন সেই পুরস্কার নির্বাচনের অধিকার সম্রাট দয়া করে আমাকেই দান করুন, এই প্রার্থনা।

বার্নার্ডের দিকে সাদর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সহাস্য সম্মতিতে সম্রাট জানালেন, বেশ তাই হবে, সাহেব। তোমার কোন প্রার্থনাই আমি আজ অপূর্ণ রাখবো না। স্বচ্ছন্দে তুমি আমার কাছে ইচ্ছামত পুরস্কার দাবী করতে পারো।

বার্নার্ডের প্রার্থনা শোনাবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন সম্রাট। অপেক্ষা করতে লাগল কৌতূহলী জনতা, কাঞ্চনবালারা দাঁড়িয়ে রইল মৌন নতমুখে। কেবল তাদের ভেতর একটি মন উৎসুক হয়ে উঠল বার্নার্ড কি প্রার্থনা করেন তাই শোনার আগ্রহে।

বিশেষ কোন ভনিতা করলেন না ডাক্তার বার্নার্ড। তিনি মুক্তকণ্ঠে বললেন, প্রার্থনা একান্ত অন্যায় হলে আমাকে ক্ষমা করবেন সম্রাট। কিন্তু আপনার কাছে আমার প্রার্থনীয় কেবল একটি রত্ন আছে। আপনার রাজ্যের একটি মাত্র নারীকেই আমি প্রার্থনা করছি। কাঞ্চনবালাদের মধ্যে যাঁর অতুলনীয় নৃত্য-কুশলতায় এতক্ষণ আপনারা মুগ্ধ হয়েছিলেন, সেই কলাবতী নারীটিকে আমি আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গিনীরূপে পেতে চাই।

বার্নাডের কথা শেষ হতে না হতেই চমকে উঠলো কাঞ্চনবালার দল।

স্তম্ভিত হল কর্পূরমঞ্জরী। পুরুষের দুঃসহ অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে সে চেয়েছিল নতুন এক সমাজ গড়তে। যেখানে নারী আপন বিচারে আপনার পথ করে চলবে ; যেখানে তাকে সহ্য করতে হবে না পুরুষের দাসত্ব। কিন্তু একি হল আজ! তার সেই বিরাট স্বপ্নের প্রাসাদে আজ হঠাৎ একি ভাঙন ধরল! আশাহত কর্পূরমঞ্জরী চিত্রলেখার মত দাঁড়িয়ে রইল নৃত্যমঞ্চে। একটিবারও মুখতুলে সে প্রিয়সখি কাদম্বিনীর দিকে তাকাতে পারল না। যদি কর্পূরমঞ্জরী একবার তাকাত তাহলে সে দেখতে পেত আনন্দের আরক্ত লজ্জায় কাদম্বিনীর মুখ আনত হয়ে আছে। মৃদু হাসির সঙ্গে সম্রাট বার্নাডের দিকে তাকিয়ে বললেন, এইমাত্র! বেশ, তোমার প্রার্থনা অপূর্ণ থাকবে না সাহেব। অদ্ভুত কৃতিত্বে তুমি যেমন হারেমের এক নারীরত্ন ফিরিয়ে এনে দিয়েছ, তার প্রতিদানে আমিও রাজ্যের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠা রমণীকে তোমার হাতে সমর্পণ করছি। সত্যিই এ তোমার উপযুক্ত কর্মের যথার্থ পুরস্কার।

তারপর সম্রাট কাদম্বিনীকে আহ্বান করলেন সিংহাসন সমীপে। আহ্বান করলেন বার্নার্ড সাহেবকেও। দুজনের মিলিত জীবনের উদ্দেশ্যে সম্রাটের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও খোদার আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন।

কেরামৎ, কেরামৎ ধ্বনিতে কম্পিত হল দরবার কক্ষ। বার্নার্ডের হাতে হাত রেখে আর একটি হৃদয়ও তেমনি আনন্দের উত্তেজনায় কম্পিত হতে লাগল।

দিল্লীশ্বর মানেই তখন জগদীশ্বর। রাজধানী ছেড়ে তিনি যেখানেই যান সেখানেই গড়ে ওঠে নতুন নগরী। তখন বর্ষা শেষ হয়েছে—শরতের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সমস্ত আকাশ। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর অপরূপ মাণিক্যখচিত শাহ-বরুজের ওপর

দাঁড়িয়ে দেখলেন কলহংসের ঝাঁক আকাশপথে উড়ে চলেছে। অমনি বাদশাহের শিকারের বাসনা জাগল।

বাদশাহ্ যাবেন শিকারে—সম্রাটের সংরক্ষিত অরণ্যে। চারদিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। আমীর-ওমরাহ্ বেগম-নর্তকী থেকে খোজা-নফর-বাবুর্চি পর্যন্ত সকলকেই সঙ্গী হতে হবে এ যাত্রায়। যাত্রার কয়েকদিন পূর্ব থেকেই রাজপথ-মেরামতির সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এগিয়ে গেল একদল লোক—সম্রাটের যাত্রাপথে যাতে কোন অসুবিধে না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আর একদল গেল কয়েকশত উটের পিঠে রাজকীয় শিবির ইত্যাদি নিয়ে—সম্রাট গিয়েই যাতে নতুন নগরীতে প্রবেশ করতে পারেন, তাই এ ব্যবস্থা।

নির্দিষ্ট দিনে সম্রাট যাত্রা করলেন। সামনে চলল দশটি হস্তী ও দশটি অশ্ব—সম্রাটের বাদশাহী পতাকা বহন করে। তারপর রইল কয়েক হাজার অশ্বারোহী ; তার ঠিক পেছনেই সুসজ্জিত অশ্বের ওপর আরোহণ করে চলল আমীর-ওমরাহ আর মনসবদারের দল। ভিস্তি থেকে জল ছড়িয়ে পথের ধুলো দূর করতে লাগল একদল লোক। মাঝে চললেন সম্রাট 'তখৎ-রওয়ানে' চড়ে। তখৎ-রওয়ান সম্রাটের ভ্রাম্যমাণ সিংহাসন। আটজন বেহারা সেই তখৎ-রওয়ান কাঁধে নিয়ে ছুটে চলল, আরো আটজন সঙ্গে রইল কাঁধ বদলের জন্যে। সম্রাটের দুপাশে চলল সুসজ্জিত দেহরক্ষী সেনাদল। কোন বিশেষ জনপদের কাছাকাছি এলেই নির্দিষ্ট কোন অশ্বারোহী হঠাৎ ভেঁপুর ধ্বনি করে সম্রাটের আগমন ঘোষণা করতে লাগল। সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক চলল দড়ি দিয়ে পথ মাপতে মাপতে। মাঝে মাঝে তারা সম্রাটকে জানিয়ে দিতে লাগল রাজধানী থেকে বেরিয়ে মহামান্য বাদশাহ কতপথ অতিক্রম করে এসেছেন। সম্রাটের ঠিক পেছনেই বিশজন অশ্বারোহী স্বর্ণমণ্ডিত আধারে বয়ে নিয়ে চলল সম্রাটের তরবারী, ঢাল, বল্লম, তীরধনুক প্রভৃতি শিকারের সরঞ্জাম। তারও পেছনে আসতে লাগল কয়েকটি সুসজ্জিত মনোরম হস্তী।

সেই হস্তীদের সজ্জার কি বাহার! কপাল থেকে শুঁড়ের প্রান্ত পর্যন্ত রক্তবর্ণের সুন্দর দুটি রেখা টানা। ললাটে কারুকার্য করা নানা রংএর আস্তরণ। পিঠের দুদিকে দুটি ঘণ্টা রুপোর শেকল দিয়ে ঝোলানো। হেলেদুলে তারা চলেছে, টুংটাং করে বাজছে ঘণ্টা। হস্তিপৃষ্ঠে পীতাম্বরে চেপে চলেছে সম্রাটের বেগম আর কাঞ্চনবালার দল। মসলিন, কিংখাবের পর্দার আড়াল থেকে তারা দেখতে লাগল পথের দুপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী। সবার পেছনে রইল খোজা প্রহরীর দল।

আগে থেকেই নির্দিষ্ট অরণ্যের পাশে একটা খোলা প্রান্তরে চক্রাকারে তোলা হয়েছিল সম্রাট ও তাঁর সহযাত্রীদের শিবির। নিয়ম অনুযায়ী হারেম বাসিনীরা পেছনে থেকে এগিয়ে নতুন শিবিরে প্রবেশ করল। তারপর গেলেন সম্রাট স্বয়ং। এরপর আমীর-ওমরাহ্ সৈন্য-সামন্তেরা যে যার নির্দিষ্ট স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। সম্রাটের জন্যে দশটি খুঁটির ওপরে টাঙানো হয়েছে সুদৃশ্য 'ডুরাসনা মঞ্জেল'। ওপরের তলাটি সম্রাটের নমাজ পড়বার জন্যে নির্দিষ্ট, নিচের বিভিন্ন অংশে থাকবে বেগম, কাঞ্চনবালা আর স্বয়ং নবাব। শিকারের শেষে শ্রান্তি এলে তা দূর করবে কাঞ্চনবালাদের নৃত্য-গীত,—এ যাত্রায় সম্রাট তাই তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

এরপর চলল সম্রাটের শিকার পর্ব। সে এক বিচিত্র দৃশ্য। কেমন একপ্রকার উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়তে লাগল শিবিরে শিবিরে।

দিনের শুরু হয়। অমনি চলতে থাকে সম্রাটের শিকার যাত্রার আয়োজন।

মুহূর্তে সারা বনভূমি বিচিত্র কোলাহল আর উদ্দাম উত্তেজনায় সহসা উচ্চকিত হয়ে ওঠে। সারাদিনে তার আর বুঝি বিরাম থাকে না। সুসজ্জিত হাতীর হাওদায় চেপে সম্রাট শিকারে যাত্রা করেন। হাতে থাকে তীক্ষ্ণ বর্শা। সঙ্গে অন্যান্য সুদক্ষ শিকারী-তীরন্দাজের দল। দ্রিম্ দ্রিম্ শব্দে শিকারের বাজনা বাজতে থাকে। শিকারী-

দের উন্মত্ত কোলাহলের সঙ্গে মিশে সে শব্দ ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে উঠতে থাকে। শান্ত নীরব বনভূমি সে শব্দে সহসা সচকিত হয়। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে যেন এক সর্বনাশের খবর ছড়িয়ে গিয়ে সেখানকার আঁকাশ বাতাসকে কম্পিত করে তোলে। সম্রাট যেদিক লক্ষ্য করে চলেন তার বিপরীত দিক থেকে হঠাৎ তুমুল একটা কোলাহল শোনা যায়। বনের প্রান্ত থেকে রৌজিনদার ও অন্যান্য লোকলস্কর বন্য পশুদের তাড়া করে নিয়ে আসে সম্রাটের দিকে। তাড়া খেয়ে প্রাণ ভয়ে ছুটতে ছুটতে তারা শিকারী দলের একেবারে মুখোমুখি এসে পড়ে। হাতীর পিঠ থেকে সম্রাট তাদের বিদ্ধ করতে থাকেন হাতের ধারালো বর্শার ফলায়। অন্যান্য শিকারীরা নিজেদের তীর ধনুক বা বর্শা বল্লম ইত্যাদি নিয়ে বেগবান অশ্বে মহা আনন্দে ধাওয়া করে এই সকল প্রাণীর পেছনে পেছনে। নিহত প্রাণীর সংখ্যা যত বাড়তে থাকে, শিকারীদের নিষ্ঠুর উল্লাসও সেই পরিমাণে বেড়ে চলে। দেখতে দেখতে পশুদের তীব্র আর্তনাদ আর চীৎকারে সারা বন কম্পিত হতে থাকে। মনে হয় সারা অরণ্য যেন আর্ত ক্রন্দনে ভেঙে পড়ছে। সম্রাটের শিকার যাত্রার সঙ্গে থাকে একদল শিক্ষিত বাজ। শিকার যখন নাগালের বাইরে চলে যায় তখন ঐ বাজ পাখিদের লেলিয়ে দেওয়া হয়। প্রাণ ভয়ে ত্রস্ত পলায়মান কোন হরিণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়তে উড়তে হঠাৎ এক সময় তারা দ্রুতবেগে ছোঁ মেরে বসে ওদের মাথার ওপর। কখনো কখনো ওদের চঞ্চুর আঘাতে খুলি উড়ে যায়, অথবা চক্ষু বিদ্ধ হয়ে যায়। তখন তাকে প্রাণ দিতে হয় পেছনের শিকারীদের বল্লমের আঘাতে। সারাদিন ধরে চলে এই শিকার-পর্ব। শিকারীদের রক্তে কেমন এক তীব্র সুরার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শিকারের মাঝেই তারা সেরে নেয় দিনের আহার। শেষ সূর্যালোক মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সারা দিনের এই উন্মাদনা আর কোলাহল হঠাৎ যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে থেমে যায়। রাত নামে। সমগ্র বনভূমির রূপ তখন

আশ্চর্য মায়াময় বলে মনে হয়। জ্যোৎস্নার হাত দিয়ে প্রকৃতি শ্রান্ত বনস্থলীর বেদনাটুকু মুছে নেয়। ডুরাসনা মঞ্জেলের তলায় কাঞ্চন-বালাদের তখন নৃত্য-গীতের আসর বসে।

সারাদিনের শ্রম কাতরতা দূর করতে সে আসরে সদলবলে যোগ দেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। নূতন আনন্দের আস্বাদে সবাই তখন যেন আবার রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। গানের সুরে সুরে আর নাচের ছন্দে বনভূমিকে মনে হয় বিচিত্র মায়ালোক। কাঞ্চনবালাদের রূপ-লাবণ্য, তাদের সাজসজ্জা আর অজস্র আলোর ছটায় সে আসরকে পরীদের জলসাঘর বলে মনে হয়। বিশ্রামের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে সকলের মনে কেমন এক যাদুর ছোঁয়া লাগে। অনেক রাত পর্যন্ত আসর চলে। সারাদিন ধরে এক অমানুষিক কোলাহলের মত্ততায় যে বনভূমি একেবারে অশান্ত হয়ে উঠেছিল, এই গভীর রাত্রির নীরবতার মাঝে কাঞ্চনবালাদের মধুর কণ্ঠস্বরে সেখানে অপরূপ সুরের বন্যা নামে।

সে সুরের মত্ততায় সকলে ভেসে গেলেও একজন শুধু একটি বিশেষ নারীকে কেন্দ্র করে তাঁর চিন্তার জাল বুনতে থাকেন। সে নারী গান করে। গানের সঙ্গে প্রাণকে বুঝি এমন করে মিশিয়ে দিতে আর কখনো দেখেননি রাজা দিলীপ সিংহ।

গানের ভেতর কোথায় যেন একটা যাদু আছে কর্পূরমঞ্জরীর। সুরের পাখিগুলোকে জ্যোৎস্নার আকাশে উড়িয়ে দিয়ে সে যেন আবার তাদের আশ্চর্য কৌশলে ফিরিয়ে আনতে পারে। সেই পাখির খেলা লক্ষ্য করে দিলীপ সিংহ মনে মনে ভাবেন তিনিও যদি কোন উপায়ে এরূপ সুরের পাখি হয়ে একবার প্রবেশ করতে পারতেন কর্পূরমঞ্জরীর হৃদয়ে, তাহলে চিরদিন বন্দী হয়ে থেকে যেতেন সেখানে। আশ্চর্য মেয়ে কর্পূরমঞ্জরী। কাঞ্চনবালাদের দলের শুধু কর্ত্রী সে নয়, দলের সেরা কাঞ্চন সে। তাই সে দিলীপ সিংহের মন এমন করে ভুলাতে পেরেছে। কিন্তু কেবল ভুললেই

চলবে না, ভুলাতে হবে সেই মেয়েকেও। কর্পূরমঞ্জরীকে জয় করবেন দিলীপ সিংহ। সম্রাটের দরবারে তিনিও ত এক সেরা রত্ন। নিজের সেই শৌর্য বীর্য আর প্রতিপত্তি দিয়ে একটা মেয়ের মন জয় করতে নিশ্চয়ই বেশী সময় লাগবে না তাঁর। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি এই মুহূর্তে কাছে না পাবার বেদনা পীড়া দিতে লাগল বাদশাহের শ্রেষ্ঠ শিকারী দিলীপ সিংহকে। আসরের একপ্রান্তে বসে দিলীপ সিংহ যখন এক রূপসী নারীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে দিয়ে গোপন সংকল্পে প্রস্তুত হতে থাকেন, তখন সম্পূর্ণ আপন মনে সুরের খেলায় আত্মহারা হয়ে গান গেয়ে যায় কর্পূরমঞ্জরী। কারুর দিকে মনোযোগ দেওয়ার কোন অবসরই তখন থাকে না তার।

দিলীপ সিংহ যে নিতান্ত অবহেলার পাত্র নয়, একথা প্রমাণ করতে রাজা সিংহের বেশী দেরি হলো না। সম্রাটের প্রিয় মনসবদারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ বলে তাঁর প্রভূত খ্যাতি ছিল। এবারে শিকারে এসে সেই খ্যাতির সত্যতা তাঁকে প্রমাণ করে দিতে হবে। এই খ্যাতিই তাঁকে এনে দেবে তার আকাঙ্ক্ষিতার জয়মাল্য।

কিন্তু সেই দিনটি সহসা যে এমন করে হাতের মুঠোয় এসে ধরা দেবে তা ভাবতে পারেননি দিলীপ সিংহ। নিভৃত বনপ্রদেশে মুখোমুখি বসেছিল দুটি ময়ূর ময়ূরী। মুখে মুখ রেখে পরস্পরকে তারা মানুষের অজ্ঞাত কোন ভাষায় বুঝি অনুরাগ জানাচ্ছিল। তাদের সেই সোহাগবন্ধন আর বিচ্ছিন্ন হল না। দূর থেকে আশ্চর্য কৌশলে শর সন্ধান করে দিলীপ সিংহ একই তীরে তাদের উভয়কেই একত্র বিদ্ধ করলেন। সত্যই এ এক বিস্ময়কর দৃশ্য। দিলীপ সিংহ তার শিকার দুটিকে তীরবিদ্ধ অবস্থাতেই বয়ে আনলেন ডুরাসনা মঞ্জেলের কাছে। যারা এ দৃশ্য দেখলো তারা কেউই দিলীপ সিংহের অস্ত্রবিদ্যার প্রশংসা না করে পারলো না। এমন কি স্বয়ং সম্রাট পর্যন্ত প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এই অভূতপূর্ব শিকারকে ঘিরে অল্পসময়ের মধ্যে ভিড় জমে উঠল। আর সেই

শিকারের পাশে দাঁড়িয়ে সগর্বে সকলের মুগ্ধ প্রশংসা কুড়াতে লাগলেন দিলীপ সিংহ।

ভিড় যখন কমে এল তখন বেগম আর কাঞ্চনবালারা শিবির থেকে বেরিয়ে এল এই উপভোগ্য শিকার দৃশ্যটি দেখবার জন্য। তখনো শিকারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন দিলীপ সিংহ। যেন এতক্ষণ এই মুহূর্তটিরই প্রতীক্ষা করছিলেন তিনি। তাঁর কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাবার লগ্ন বুঝি এল এতদিনে। কাঞ্চনবালারা যখন তাঁর এই আশ্চর্য শিকারটিকে দেখতে লাগল সপ্রশংস দৃষ্টিতে, তখন দিলীপ সিংহ খুঁজতে লাগলেন একটি বিশেষ মুখের দৃষ্টি। সে দৃষ্টি কিন্তু প্রথম দর্শনেই আনত হয়ে রইল। একটু নিবিষ্ট হয়ে লক্ষ্য করলেই দেখতে পেতেন দিলীপ সিংহ তাঁর এই অভূতপূর্ব কীর্তির সামনে দাঁড়িয়ে শিকারীর প্রতি সশ্রদ্ধ মুগ্ধতার বদলে কী দুর্জয় আক্রোশ আর ঘৃণাই না জমে উঠছিল কর্পূরমঞ্জরীর মনে। প্রাণহীন, বিবেকহীন মানুষের নিষ্ঠুর লীলা সে দেখে এসেছে এতকাল। সেই সতীদাহের অগ্নি-স্বাক্ষর যেন সে আর একবার নতুন করে দেখতে পেল আজিকার এই সামান্য ঘটনার ভেতর দিয়ে।

কিন্তু নির্বোধ দিলীপ সিংহ কর্পূরমঞ্জরীর মনের এ-রূপটি একেবারেই দেখতে পেলেন না। সেই মুহূর্তেই মনে মনে তিনি এর পরবর্তীপন্থা ঠিক করে ফেললেন। পর পর কয়েকদিন ধরে দিলীপ সিংহ লক্ষ্য করছিলেন একটি ঘটনা। প্রতিদিন নাচগানের আসরের শেষে সমস্ত শিবিরের বাতিগুলো যখন একে একে নিভে যায় তখন একটি ছায়ামূর্তি কাঞ্চনমহল থেকে বেরিয়ে আসে। ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সেই মূর্তি শিবিরগুলো ছাড়িয়ে বনের মধ্যে এগিয়ে যায়। তার কতক্ষণ পরে সে আবার ফিরে আসে। দিলীপ সিংহ লক্ষ্য করেছেন এ দৃশ্য। আর তিনি এও জানেন সে হল মহলের শ্রেষ্ঠ কাঞ্চন কর্পূরমঞ্জরী। প্রতিদিন এক একজন ওমরাহের পর্যায়ক্রমে ভার পড়ে শিবির পাহারা দেবার। আজ সে পালা

দিলীপ সিংহের। মনে মনে সংকল্প স্থির করলেন দিলীপ সিংহ। আজ রাতে কর্পূরমঞ্জরীকে বনের পথে তিনি অনুসরণ করবেন, তার সঙ্গে যেমন করেই হোক সাক্ষাৎ করবেন তিনি।

সেদিন আসরের শেষে নিশ্চিন্ত বিশ্রামের কোলে যখন সকলে গা এলিয়ে দিয়েছে তখন কর্পূরমঞ্জরী পায়ে পায়ে বনের দিকে চলতে লাগল ; তখন সে জানতেই পারলো না যে একটি শিকারী পুরুষ তার সঙ্গ নিয়েছে। আপন মনেই সে হাঁটতে লাগলো এই শান্ত নির্জন রাত্রির জ্যোৎস্নায় গা ডুবিয়ে। এখানে এসে এই একটা অদ্ভুত খেয়াল তাকে পেয়ে বসেছে। বন সে এর আগে কখনো দেখেনি। কিন্তু গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের প্রতি আবাল্য একটা আকর্ষণ সে অনুভব করে এসেছে। সুদূর বাংলায় অসংখ্য লতাপাতা আর গাছ গাছালি ঘেরা ছায়াচ্ছন্ন স্নিগ্ধ এক পল্লীর কোলে তার জন্ম। সেই নিবিড় গহন পল্লীপ্রকৃতির শ্যামল মায়া এক আশ্চর্য মোহ বিস্তার করেছিল তার সেদিনের জীবন জুড়ে। তারপর কতকাল তাদের ছেড়ে এসেছে কর্পূরমঞ্জরী। আজ ভারতের এই রুক্ষ, অনুর্বর প্রান্তরের মাঝখানে হঠাৎ শ্যামল অরণ্যের সন্ধান পেয়ে দীর্ঘদিন পরে আবার সেই হারানো জীবনের স্বাদ তার মনে পড়ছে। কিন্তু দিনে এ বনের চেহারা আলাদা। শিকারীদের সমবেত মাতামাতিতে এখানে সব শান্তি আর মাধুর্য বারবার ভেঙে খান খান হয়ে যেতে থাকে। আবার প্রতিটি রাত্রির অবসরে তার আপন প্রাণের গভীরতা ফিরে পায় এই অরণ্যভূমি। রাতের স্থির অন্ধকারে এক সুগভীর মৌনতা আর অটল প্রশান্তির মাঝে কি এক অপরূপ রহস্য যেন ঘনিয়ে আসে সারা অরণ্যের বুক জুড়ে। ঝিঁঝি ডাকে, জোনাকীরা আলো জ্বালে। তখন আর কিছুতেই শয্যায় পড়ে থাকতে পারে না কর্পূরমঞ্জরী। বারবার তাই রাতের সমস্ত ভয়কে উপেক্ষা করে এখানে সে ছুটে আসে। বনের কোন নিভৃত লোকে তৃণশয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে সে রহস্যময়ী প্রকৃতির মাঝে তন্ময় হয়ে যায়।

দুঃসাহসী সে আবাল্য, তাই ভয়ের মাঝেই সে সুন্দরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যেতে ভালবাসে।

রোজকার মত আজও তার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে এসে বসল কর্পূরমঞ্জরী। স্থানটি তৃণাচ্ছাদিত। একটিমাত্র দীর্ঘকায় বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। সেই বৃক্ষের কাণ্ড থেকে একটি লতা, পুষ্প-পল্লবে বিচিত্র এক বেষ্টনী রচনা করে বৃক্ষটিকে ছেয়ে ফেলেছে। গন্ধ ভেসে আসছে। বন্যপুষ্পের মিষ্টি মাদক এক প্রকার সৌরভ। আজ বুঝি পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন তিথি। চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল আর স্বচ্ছ বলে মনে হচ্ছে। বৃক্ষের ছায়া এসে পড়েছে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে। কর্পূরমঞ্জরী গুনগুন করে গান করতে লাগল। ঠিক একে গান বলা চলে না, কোন একটা সুর নিয়ে আপনমনে খেলা করা। নিঝুম অরণ্যের মাঝখানে সে সুর একটা সূক্ষ্ম মায়াময়তার সৃষ্টি করে চলল।

সহসা চমকে উঠল কর্পূরমঞ্জরী। গান থেমে গেল। সামনে তৃণাচ্ছাদিত যে স্থানটিতে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল সেখানে একটা ছায়া এসে পড়ল। কোন বন্য জানোয়ার কিনা তাই দেখবার জন্য কর্পূর চমকে মুখ ফেরাতেই যে দৃশ্য সে দেখতে পেল তাতে তার বিস্ময়ের মাত্রা বেড়েই গেল।

দিলীপ সিংহ সেই বিরাট বনস্পতির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। কর্পূরমঞ্জরীকে ফিরতে দেখেই বললেন, এত রাতে এখানে মঞ্জরী!

প্রথম পরিচয়েই নামটাকে সংক্ষিপ্ত করে নেবার ভেতর মনের যে ধরণের কামনা প্রকাশ পায় তা বুঝে নিতে দেরি হল না বুদ্ধিমতী কর্পূরমঞ্জরীর।

বন্য প্রদেশে জন্তুজানোয়ারের ভয় আছে ঠিক, কিন্তু তার চেয়ে মানুষ জানোয়ার কম ভীতিজনক নয়। তাই সে পরিস্থিতির হাত

থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যই কৌতুকের হাসিতে ভেঙে পড়ে কর্পূরমঞ্জরী বলল, গভীর রাতে মহারাজ কি শিকারে বেরিয়েছেন নাকি ?

কর্পূরের হাসিতে যোগ দিলেন দিলীপ সিংহ। বললেন, তোমার অন্বেষণ যদি শিকারের সন্ধান হয়, তবে আমার যাত্রার উদ্দেশ্য তাই বলে ধরে নিতে পার।

তু'জনেই কথার শেষে হেসে উঠল। দিলীপ সিংহ ভাবলেন পরিস্থিতি প্রসন্ন, শিকার স্বেচ্ছায় ধরা দেবে। আর হাসির মায়ায় কর্পূরমঞ্জরী শিকারীকে আচ্ছন্ন করে জাল কেটে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল।

এবার দিলীপ সিংহ চারদিক একবার তাকালেন, তারপর কর্পূরমঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, স্থানটি সত্যিই নির্জন। তুমি বোধ হয় রোজই এখানে আস, তাই না ?

হাঁ মহারাজ, নির্জনতা আমি বড় ভালবাসি,—উত্তর দিল কর্পূরমঞ্জরী।

আমিও তা ভালবাসি মঞ্জরী, বললেন দিলীপ সিংহ, যদি তোমার মত এমনি একজন সঙ্গী পেতাম তাহলে সারদিনের এইসব কোলাহল থেকে বহুদূরে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারতাম।

ভাবের আবেগে দিলীপ সিংহের শেষের কথাগুলো বড় বেশী ভারী হয়ে উঠল। কর্পূরমঞ্জরী বুঝল আজ বাদশাহের সঙ্গে দিলীপ সিংহ একটু বেশীমাত্রায় সুরা পান করেছে। চোখের রঙ এখন মনেও ছড়িয়ে পড়েছে। এর থেকে মুক্তি পেতে গেলে নিজেকে অভিনয়ে অংশ নিতে হবে।

কর্পূরমঞ্জরী হেসে বলল, সামান্য নর্তকীর ধৃষ্টতা মাপ করবেন মহারাজ, এ বিষয়ে একটি প্রশ্ন করতে পারি কি ?

আরও কাছে সরে এলেন দিলীপ সিংহ। বললেন, তোমার নৃত্য-গীতে মুগ্ধ হয়নি এমন পুরুষ সারা আগ্রাতে নেই। তাহলে

সামান্য একটা প্রশ্নের জন্য এত সঙ্কোচ কেন তোমার? সহস্র প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তৈরি হয়ে রইলাম।

দিলীপ সিংহকে অতি বিনীত বলে মনে হল সেই মুহূর্তে। কর্পূরমঞ্জরী বলল, মহারাণী কি রাজা দিলীপ সিংহকে সঙ্গদানে অক্ষম?

আগুন ধরে গেছে ততক্ষণে দিলীপ সিংহের মনে। লালসার সেই লকলকে শিখাটা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল সহসা। দিলীপ সিংহ বললেন, মহারাণী ত দূরের কথা, স্বয়ং বাদশাহের এতবড় সাম্রাজ্যে তোমার মত রমণীরত্ন দ্বিতীয় আর নেই মঞ্জরী। তোমাকে দেখবার পর থেকে নিজরাজ্যে ফিরে যাবার কথা আমি ভুলে গেছি।

হেসে বলল কর্পূরমঞ্জরী, সে কি মহারাজ, রাজকার্যে অবহেলা সম্পূর্ণ অনুচিত।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজা দিলীপ সিংহ। ম্লান হাসি হেসে বললেন, হৃদয়কে উপবাসী রেখে কেমন করে শাসন করি, মঞ্জরী! যদি কানদিন এ হৃদয় পূর্ণ করতে পারি তাহলে সেদিনই শুধু সম্ভব হবে আমার সব কাজ সম্পন্ন করা।

কর্পূরমঞ্জরী বলল, দূরে থাকলেই আকর্ষণ বাড়ে মহারাজ। কাছে এলেই সব রঙ সাদা হয়ে যায়। তাই আমরা দূরে থেকেই আনাদের মন তোষণ করি। কাছে যাবার দুঃসাহস করি না। হয়ত আার একথায় ব্যথা পাবেন আপনি। কিন্তু এই সত্য মহারাজ।

ওতে ক্ষতবিক্ষত হতে হয় মঞ্জরী। তুমি সহস্রচক্ষুর ভোগের সামগ্রী, একথা ভাবতে গেলে সমস্ত দেহে একটা তীব্র যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়—গভীর বেদনার সুরে কথাগুলো বলে গেলেন দিলীপ সিংহ।

কর্পূরমঞ্জরী বলল, সম্পূর্ণ অসহায়া নর্তকীকে ও কথা বলে পরাধিনী করবেন না, মহারাজ। সমস্ত কাঞ্চনবালাদের দায়িত্ব রয়েছে আমার ওপর। এ অবস্থায় আমি বাদশাহের করুণা প্রার্থী। তিনি কৃপা করে আমাদের আস্তানা দিয়েছেন। ভরণ পোষণের

ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। এর থেকে নিজেকে কি করে মুক্ত করে নিতে পারি মহারাজ। আমি সেচ্ছায় কাঞ্চনবালার বৃত্তি ত্যাগ করতে চাইলে হয়ত বাদশাহ বাধা দেবেন না, কিন্তু তাতে সমস্ত কাঞ্চনপুরী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। সে পাপের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করব কিসের বিনিময়ে মহারাজ।

দিলীপ সিংহ বললেন, আমি যদি আমার যোধপুরে তোমাদের সকলকে নিয়ে যাই। কর্পূরমঞ্জরী বলল, উত্তেজিত হবেন না মহারাজ, সামান্য কাঞ্চনবালাদের জন্য নিশ্চয়ই আপনি বাদশাহের বিরাগভাজন হতে চাইবেন না।

তারপর এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে বলল, আর তাতে কর্পূরমঞ্জরীর কোন লাভই হবে না মহারাজ। এতগুলি কাঞ্চনবালাকে যোধপুরে স্থান দিলে কর্পূরমঞ্জরী হয়ত কোনদিন মহারাজের মন থেকে কর্পূরের মতই উড়ে যাবে। তখন নতুন কোন কাঞ্চনবালা জুড়ে বসবে মহারাজের হৃদয় সিংহাসন।

দিলীপ সিংহ সহসা কর্পূরমঞ্জরীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, আমার প্রেমের আকর্ষণে তুমি সব বাধা ঠেলে ফেলে একা বেরিয়ে আসতে পার না মঞ্জরী !

হাতখানা টেনে নিল না কর্পূরমঞ্জরী। সে জানত এই মুহূর্তে প্রবল বিতৃষ্ণায় হাতখানা দিলীপ সিংহের কাছ থেকে সরিয়ে নিলেই ক্রুদ্ধ পশুর মত সে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। তাই নিজেকে সংযত রেখেই কর্পূরমঞ্জরী বলল, মুহূর্তের চিন্তায় কোন কাজ করলে হঠকারিতা হবে মহারাজ। আপনি এ বিষয়ে স্থির হয়ে চিন্তা করুন, আর আমাকেও চিন্তার অবকাশ দিন। ঈশ্বরের রাজ্যে যা অবশ্যই ঘটবে তাকে কারু ইচ্ছাই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

এবার সহজেই হাত ছাড়িয়ে নিতে পারল কর্পূরমঞ্জরী। হেসে বলল, অনেক রাত হয়েছে মহারাজ। চলুন আমরা আজ শিবিরে ফিরে যাই।

মোহগ্রস্ত হয়ে গেছেন দিলীপ সিংহ। কর্পূরমঞ্জরীর কথা উপেক্ষা করার মত সাধ্য রইল না তাঁর। কর্পূরমঞ্জরীকে অনুসরণ করে দিলীপ সিংহ শিবিরের অভিমুখে ফিরে চললেন। পথে কেউ কোন কথা বলল না। কর্পূরমঞ্জরী একটা বিরাট অঘটনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পেরে ঈশ্বরের অপার করুণার কথা স্মরণ করতে লাগল। আর দিলীপ সিংহ ভাবতে লাগলেন, একদিনেই সব কিছু হাতের মুঠোয় পেতে চাইলে পরিণামে সমূহ ক্ষতি হতে পারে। শিকারকে ধীরে ধীরে প্রলুব্ধ করে আয়ত্তে আনাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কর্পূরমঞ্জরী সেদিনের মত রক্ষা পেলেও দিলীপ সিংহের লালসায় ভরা দুটো চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া বড় কষ্টকর হয়ে উঠল। কারণে অকারণে দিলীপ সিংহ তার সঙ্গে দেখা করতে চান। এমনকি কাঞ্চনবালাদের আস্তানা পর্যন্ত ধাওয়া করে আসেন। কর্পূরমঞ্জরী ইচ্ছাপূরণ না করলে হিংস্র বাঘের মত দুটো চোখ তাঁর জ্বলতে থাকে। সুযোগ খোঁজেন দিলীপ সিংহ কর্পূরমঞ্জরীকে একান্ত গোপনে পাবার। দিলীপ সিংহের আকাঙ্ক্ষা যত বাড়তে থাকে কর্পূরমঞ্জরীর কঠোরতাও সেই পরিমাণে বেড়ে চলে।

কিন্তু দিলীপ সিংহ বাদশাহের আশ্রিতা এই কাঞ্চনবালাদের কোনরূপ অনিষ্ট করবার সাহস পান না। তাছাড়া সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের বিশেষ অনুগ্রহ যে এই দলটির ওপর রয়েছে তা দরবারের কারু কাছেই আর অবিদিত নয়।

দিলীপ সিংহ এবার নতুন এক পন্থা অনুসরণ করলেন। তিনি কর্পূরমঞ্জরীকে উপেক্ষা করে তারই দলের অন্যান্য কাঞ্চনদের সঙ্গে আলাপচারী শুরু করে দিলেন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন তাদের নৃত্য-গীতের। রাজসভায় দিলীপের সমর্থকেরা কর্পূরমঞ্জরী

ছাড়া অন্যান্য কাঞ্চনবালাদের নৃত্য-গীতের বেলায় প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠত। দরবারের অন্য সকলে সেই সুরে সুর মিলিয়ে বাহবা দিত।

এই নতুন কৌশল লক্ষ্য করত কর্পূরমঞ্জরী। তার শিল্পীমন দিলীপ সিংহের এই নীচতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলত। কিন্তু এই প্রশংসার এক বিষময় ফল ফলতে লাগল কাঞ্চনবালাদের মধ্যে। প্রশংসায় তারা এমনি প্রলুব্ধ হল যে প্রশংসাকারীদের সঙ্গ তাদের কাছে বিশেষ কাম্য হয়ে উঠল। তারা ভুলে গেল তাদের কাঞ্চনপুরীর গৌরবের কথা, ভুলে গেল কর্পূরমঞ্জরীকে।

তাদের কয়েকজন দিলীপ সিংহের দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে লিপ্ত হল ঘৃণ্যতম ভোগাসক্তিতে। কাঞ্চনপুরীতে প্রবেশ করল পাপের কীট।

কর্পূরমঞ্জরীর শাসন আর সোহাগ কোনকিছুই কাঞ্চনবালাদের জাগ্রত কামনার আগুনকে নিভিয়ে দিতে পারল না। অসহায়ের মত শুধু কর্পূরমঞ্জরী চেয়ে দেখল দিলীপ সিংহের কৌশলে পাপাসক্তা কাঞ্চনবালার দল একে একে প্রবেশ করছে বাদশাহের হারেমে। কেউ হচ্ছে হারেম রক্ষিকা। আবার কেউ মাসোহারার বিনিময়ে করে চলেছে রূপোপজীবিনীর কাজ।

কয়েকটি বছরের মধ্যেই শূন্য হয়ে গেল কাঞ্চনপুরী। অসহায় দৃষ্টি মেলে কর্পূরমঞ্জরী শুধু তাকিয়ে রইল অনাগত অস্পষ্ট ভবিষ্যতের দিকে। যে প্রাণগুলিকে এক নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনায় সে একদিন জাগিয়ে তুলেছিল, সেই প্রাণের সমাধি সে নিজের চোখের সামনেই দেখতে পেল।

নৃত্য-গীতের আসরে আর তেমন ডাক আসে না কর্পূরমঞ্জরীর। জীবনের সপ্ততন্ত্রী বীণার তারগুলো তার এক এক করে ছিঁড়ে গেছে, তাই আর আজকাল উৎসাহ আসে না কোন কাজে। কেবল স্বাহার মেয়েটি যখন কাছে এসে দাঁড়ায়, তখন পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে

তার দিকে তাকায় কর্পূরমঞ্জরী। সেই নাক, সেই মুখ, সেই অপরূপ গড়ন। প্রথম যেদিনটি সে স্বাহাকে দেখেছিল, ঠিক তেমনি একটি আনন্দময় কিশোরী মূর্তি। টপ্ টপ্ করে চোখের কোল বেয়ে ধারা গড়িয়ে পড়ে কর্পূরমঞ্জরীর। না, কিছুতেই তার উদ্দেশ্যকে সে বিফল হতে দেবে না। স্বাহার কন্যা ললিতার মাঝেই তার সাধনা বেঁচে উঠবে।

নির্জনপুরীতে আবার নাচের নূপুর বাজে। বিচিত্র সুরের পাখিগুলো আবার সুরের আলপনা এঁকে উড়ে ফেরে বাতাসে। শিল্পী কর্পূরমঞ্জরীর ভাঙা মনের দেউলে ধীরে ধীরে দল মেলে জেগে উঠতে থাকে একটি অপরূপ কুসুম। তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কর্পূরমঞ্জরী ভাবে, আজও সে বেঁচে আছে; হয়ত সবার মত এমন অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু আসবে না তার কোনদিন।

এক সন্ধ্যায় বিশেষ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল দরবারে। বিদেশী এক রাষ্ট্রদূতকে সাড়ম্বরে বিদায় দিচ্ছিলেন সম্রাট। সেই উপলক্ষে ডাক পড়ল কর্পূরমঞ্জরীর। বহুদিন পরে ডাক এল দরবার থেকে। কর্পূরমঞ্জরী তাই আজ মনের মত করে সাজাল নিজেকে। সাজসজ্জা আর প্রসাধনের পর সে যখন পথে এসে নামল তখন তাকে নটি বিদ্যুৎপর্ণা বলেই মনে হচ্ছিল। আজ এ সজ্জার পেছনে একটা গভীর উদ্দেশ্য ছিল তার। দিলীপ সিংহের সামনে আজ সে নাচবে। সে আজ প্রমাণ করে দেবে যে মূর্খ দিলীপ সিংহ তার পরাভবের যে ছবিটি মনে মনে এঁকে রেখেছে, তার সঙ্গে কর্পূরমঞ্জরীর অণুমাত্র মিল নেই। নর্তকী কর্পূরমঞ্জরীর আগুন তেমনি অম্লান দীপ্তিতে বিকীর্ণ হচ্ছে।

যথাসময়ে দরবার কক্ষে এসে পৌঁছল কর্পূরমঞ্জরী। বিদ্যুৎ কটাক্ষে সে দেখে নিল, যথাস্থানে আজও সঙ্গীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন দিলীপ সিংহ। মৃদু হাসল সে মনে মনে। ছন্দে ছন্দে অঞ্চলের আবর্তলীলায় আশ্চর্য এক যাদু বিস্তার করল কর্পূরমঞ্জরী।

নৃত্যের মাঝে কখন নিজেকে সে হারিয়ে ফেলল সম্পূর্ণভাবে। একের পর এক নেচে গেল সে। প্রাণের খুশিতে গানের ঝর্ণাধারা ঝরিয়ে দিল। আজ সে স্রষ্টা। সম্রাটের আদেশ পালনের জন্য সে আজ আসেনি, এসেছে নিজের সৃষ্টির মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে।

এক সময় গান থামল, নৃত্যও থেমে গেল। এতক্ষণে স্তম্ভিত সভা সহসা উচ্ছ্বসিত আনন্দ কলরবে ভেঙে পড়ল। সম্রাট সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নর্তকী তুমি। আজ এই আনন্দের দিনে তোমাকে আমি যথাযোগ্য পুরস্কৃত করতে চাই ; প্রার্থনা কর তোমার মনোমত পুরস্কার।

সম্রাটের ঘোষণা করজোড়ে শুনল কর্পূরমঞ্জরী। বিদ্যুতের মত একটি চিন্তা তার মনের মধ্যে খেলে গেল। ধীরে ধীরে আনত মুখখানি তুলে সে বলল, অসহায়ের রক্ষাকর্তা মোগল সম্রাটের কাছে আমার একটিমাত্র প্রার্থনা আছে। আমি শুনেছি বাদশাহের পরমশ্রদ্ধেয় পিতা মহামতি আকবর একটি রাজপুত রমণীকে সহমরণের নির্যাতন থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আরও শুনেছি সহমরণে অনিচ্ছুক সেই রমণীর হৃদয়হীন পুত্রকেও তিনি কারারুদ্ধ করেছিলেন। তাই আজ সাধারণ এক নারী হয়ে আমি ভারত-সম্রাটের কাছে আমার দীনতম একটি প্রার্থনা জানাচ্ছি ; আর্তের রক্ষক সম্রাট এই হৃদয়হীন সহমরণ প্রথা বন্ধ করুন।

একি বিস্ময়কর প্রার্থনা এক নর্তকীর! মুহূর্তে আনন্দমুখর সভা স্তব্ধ হয়ে গেল। রাজপুত ওমরাহেরা তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, বাদশাহ, সর্বধর্মের প্রতি আপনার সমান আচরণ আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। সতীদাহ হিন্দুরমণীদের একটি পবিত্র আত্মশুদ্ধির উপায়। এই সনাতন প্রথাটিকে বন্ধ করে দিতে গেলে হিন্দুসমাজের ভেতর যে অশান্তির আগুন জ্বলবে, তাকে বন্ধ করার কোন শক্তি তখন থাকবে না আমাদের হাতে। নর্তকীর এ অন্যায় আবেদনের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ওমরাহদের উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি সহাস্যে বললেন, নর্তকী, তুমি মণিমাণিক্য, ধনরত্ন যা ইচ্ছা প্রার্থনা কর। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতির জটিলতার মধ্যে নিজেকে জড়াবার চেষ্টা করো না।

কর্পূরমঞ্জরীর শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হল। কিন্তু বিচলিত না হয়ে সে বলল, এতদিন সম্রাটের অশেষ অনুগ্রহ আমরা লাভ করেছি। আশ্রয়হীনাদের আশ্রয় দিয়েছেন। এর চেয়ে অধিক আর কোন পুরস্কার আমার কাম্য নয় সম্রাট।

কর্পূরমঞ্জরীর কৃতজ্ঞতাবোধের পরিচয় পেয়ে বাদশাহ খুশী হলেন। সিংহাসন থেকে একমুঠো সোনার মোহর ছুঁড়ে দিলেন তার দিকে। কর্পূরমঞ্জরীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল সেই মোহর-গুলো। জ্বল জ্বল করে উঠল সোনা। কর্পূরমঞ্জরীর মনে হল তার চারদিকে ঐ সোনার মোহরগুলো লকলকে আগুনের শিখা মেলে জ্বলছে। অনুষ্ঠানের শেষে দরবার থেকে ফিরতে রাত হল কর্পূরমঞ্জরীর। আবছা চাঁদের আলোয় নগরীকে বড় রহস্যময় বলে মনে হতে লাগল। কর্পূরমঞ্জরী শিবিকাবাহকদের চলে যেতে বলে একাকী পথের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল।

রাত হয়েছে। নগরীর বিপণীগুলির আলো একে একে নিভে গেল। দু'একটি সরাই থেকে কেবল যাত্রীদের এলোমেলো কথা ভেসে আসছিল। কর্পূরমঞ্জরী পথ চলতে চলতে ভাবতে লাগল। ভাবতে লাগল তার জীবনের কথা। কি বিচিত্র এই জীবন! সীমাহীন সমুদ্রের বুকে ছোট একটা ভেলার মত দিশাহীন যাত্রায় ভেসে চলেচে। কাল যারা সঙ্গী ছিল, আজ তারা নেই। শুধু একটা দুর্বহ স্মৃতির ভার তারা রেখে গেছে সারা বর্তমান আর অনাগত ভবিষ্যৎ জুড়ে। তার জীবনের নৌকো কোন্ কূলে ভিড়বে, কি অনন্তকাল ধরে এমনি করে সে ভেসে চলবে সে রহস্য একমাত্র অন্তর্যামী পুরুষই জানেন।

পেছনে একটা চলন্ত ঘোড়ার শব্দ পেল কর্পূরমঞ্জরী। সে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, কিন্তু আবছা আলোয় কিছু বোঝা গেল না। কর্পূরমঞ্জরীর থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়ার পায়ের শব্দটাও হঠাৎ থেমে গেল।

নগরের পথ ছেড়ে এবার শহরতলীর একটা পথ ধরে চলতে লাগল কর্পূরমঞ্জরী। আবার পেছনে শুনতে পেল ঘোড়ার পায়ের শব্দ। ভীত হল কর্পূরমঞ্জরী। স্থানটি নির্জন। তার ওপর রহস্যময় কোন ঘোড়সওয়ার তাকে অনুসরণ করছে বলেই মনে হল। সে দ্রুত পা চালাল। ঘোড়ার পায়ের শব্দও দ্রুততর হল। কর্পূরমঞ্জরী একটা কিছু অপ্রত্যাশিত অঘটনের ভয়ে দৌড়তে আরম্ভ করল। আরও দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল পেছনের ঘোড়সওয়ার। পথের ধারেই বিরাট একটি বাড়ী চোখে পড়ল কর্পূরমঞ্জরীর। দৌড়তে দৌড়তে সে বাড়ীটির কাছে পৌঁছে দেখল সেটি একটি গীর্জা। রাত হয়েছিল, তাই গীর্জার প্রধান ফটক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কর্পূরমঞ্জরী ফটকের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল।

ঘোড়সওয়ার ফটকের সামনে এসে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল। তারপর একলাফে ঘোড়া থেকে নেমে কর্পূরমঞ্জরীর একটা হাত টেনে ধরল সে। চীৎকার করে ফিরে তাকাল কর্পূরমঞ্জরী। বাঘের মত হিংস্র দুটো চোখ জ্বলছে দিলীপ সিংহের।

সহসা গীর্জার লোহার ফটকটাও খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন যাজক ইমানুয়েল। ধর্মযাজককে বেরিয়ে আসতে দেখে কর্পূরমঞ্জরী আকুল হয়ে তাকে রক্ষা করবার জন্য আবেদন জানাল।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন অশ্বারোহী দিলীপ সিংহের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ইমানুয়েল হেসে কর্পূরমঞ্জরীর আর একখানা হাত ধরে বললেন, আশ্রয়প্রার্থী গীর্জার মধ্যেই স্থান পাবে।

হঠাৎ দিলীপ সিংহের অসি কোষমুক্ত হল।

ইমানুয়েল হেসে বললেন, দেখে রাজপুত বলে মনে হচ্ছে তোমাদের। জানতাম অস্ত্রহীনকে অস্ত্রাঘাত করে না রাজপুত।

জনৈক সঙ্গীর কোষ থেকে আর একখানা অসি টেনে নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন দিলীপ সিংহ ইমানুয়েলের দিকে। ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, বাঁচার এই সুযোগ নাও যাজক। নিরস্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে অস্ত্র দিয়ে উৎখাত করাই রাজপুতের ধর্ম।

দিলীপ সিংহের সঙ্গীরা বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, ধর্মযাজককে আবার অস্ত্র ধারণ করার কৌশলটাও শিখিয়ে দিতে হবে নাকি?

বিদ্যুৎবেগে ইমানুয়েলের অসির আঘাত এসে পড়ল দিলীপ সিংহের অসির ওপর। একি বিস্ময়! কয়েকটি বিদ্যুৎ ঝলকের পর দেখা গেল নিপুণ যোদ্ধা দিলীপ সিংহ শূন্যহাতে দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁর হাতের অসিখানা অদূরে মাটির ওপর ছিটকে পড়েছে।

অমনি দৌড়ে এল দিলীপ সিংহের সঙ্গীরা। হাত তুলে তাদের বারণ করলেন দিলীপ সিংহ। তারপর যাজকের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই নারী ভ্রষ্টা। পবিত্র দাহক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসে ও হিন্দুধর্মের মর্যাদা নষ্ট করেছে। সুতরাং এ নারী আমাদের বধ্য।

ইমানুয়েল অসি ফিরিয়ে দিলেন। হেসে বললেন, সামান্য একটি প্রশ্ন আমি তোমাদের করব রাজপুত। যদি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পার তাহলে এ নারীকে আমি তোমাদের হাতে অবশ্যই তুলে দেব। আর যদি না পার তাহলে প্রতিজ্ঞা কর যে এই নারীকে ত্যাগ করে তোমরা ফিরে যাবে।

দিলীপ সিংহ বললেন, বেশ, কি প্রশ্ন করতে চাও, কর।

ইমানুয়েলের মুখে তেমনি প্রসন্ন হাসি। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার আগুন থেকে কোন ভয় নেই, সে এগিয়ে এসে এই রমণীকে এখান থেকে নিয়ে যাক।

সবাই স্তব্ধ। নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন দিলীপ সিংহ। কয়েক

মুহূর্ত এমনি কাটল। তারপর অশ্বারোহণে সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে গেলেন তিনি।

কর্পূরমঞ্জরী গীর্জার ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে সমস্ত ঘটনাটি দেখছিল!

সারা দেহ তার থর থর করে কাঁপছিল। দিলীপ সিংহ দলবল নিয়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এতক্ষণের উদ্বেগের পর মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যাচ্ছিল সে। যাজক ইমানুয়েল তাকে ধরে ফেললেন। তারপর যাজকের হাত ধরে কর্পূরমঞ্জরী গীর্জার ভেতরে প্রবেশ করল।

ইমানুয়েল এখানকার প্রধান যাজক। আকবর খৃস্টানদের আগ্রাতে গীর্জা প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়েছিলেন একসময়। বাদশা জাহাঙ্গীরও খৃস্টান পাদ্রীদের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইমানুয়েল দীর্ঘ পঁচিশ বছর আগে কোথা থেকে আসেন আগ্রায়। তারপর আপন কর্ম ও সাধনার বলে তিনি আগ্রার এই গীর্জার প্রধান ধর্ম-যাজকের পদে উন্নীত হন।

ইমানুয়েল কর্পূরমঞ্জরীকে আপন কক্ষে নিয়ে গেলেন। একটি শয্যায় তাকে শুইয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে কর্পূরমঞ্জরী অনেকটা সুস্থ বোধ করল। সে দেখল, যে ঘরে শুয়ে আছে সে ঘরখানার আয়তন খুব বড় নয়। তবে অত্যন্ত পরিষ্কার পরিছন্ন এ ঘরখানা। একটি প্রশস্ত তাকের উপর ঝকঝকে কয়েকখানা বই রয়েছে। ওদিকে ঘরের দেয়ালে টাঙানো নানা-ধরনের ছবি। একটি রমণী এক শিশুকে কোলে নিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। কি স্নিগ্ধ সে দৃষ্টি! অন্যদিকে একটি মানুষকে পেরেক দিয়ে মনে হল দুটো কাঠের সঙ্গে গেঁথে রাখা হয়েছে। মানুষটির মুখে যন্ত্রণার কোন চিহ্ন দেখতে পেল না সে। কতক্ষণ কর্পূরমঞ্জরী তাকিয়ে রইল সেদিকে। চোখদুটি যেন তার কোন অদৃশ্য আকর্ষণে বদ্ধ হয়ে গেল। ইমানুয়েল কখন ঘরে ঢুকেছেন এবং তাকে লক্ষ্য করছেন তা সে বুঝতে পারল না।

একসময় ইমানুয়েল কর্পূরমঞ্জরীর কাছে এসে বললেন, তুমি যাঁর ছবিটি দেখছ বোন, তিনিই যিশু।

কর্পূরমঞ্জরী শয্যার ওপর উঠে বসল। সে এখন অনেকটা সুস্থতা বোধ করছিল। কৌতূহলী হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, যিশু কে ?

কর্পূরমঞ্জরী যিশুর নাম এই প্রথম শুনল। ইমানুয়েল বললেন, তিনি জগতের পাপী তাপী অন্ধ আতুর সকলেরই মুক্তিদাতা।

কর্পূরমঞ্জরী যুক্তকরে নমস্কার করল। তারপর ইমানুয়েলের দিকে তাকিয়ে বলল, পাদ্রী সাহেব, যদি অনুমতি করেন তাহলে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

ইমানুয়েল মাথা নাড়লেন। কর্পূরমঞ্জরী বলল, মুক্তিদাতা যিশু এই কাঠের উপর বিদ্ধ হয়ে আছেন কেন ?

—সমস্ত যন্ত্রণাকে তিনি নিজের দেহে তুলে নিলেন, বিশ্বের মানুষকে সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার জন্য !

বলতে লাগলেন ইমানুয়েল, জান বোন, ক্রুশে বিদ্ধ হবার মত যন্ত্রণা আর কোন শাস্তিতে আছে কিনা জানি না। কাষ্ঠদণ্ডের ওপর মৃত্যুর আদেশপ্রাপ্ত আসামীকে শোয়ান হয়। তারপর তার হাতে ও পায়ে চারটি বা তারও বেশী পেরেক ঠুকে গেঁথে দেওয়া হয়। মানুষটি যখন সম্পূর্ণ বিদ্ধ হয়ে যায়, তখন ঐ কাষ্ঠদণ্ডটির নিম্ন অংশ মাটিতে দৃঢ় ভাবে প্রোথিত করা হয়। সেই ভয়ঙ্কর অবস্থায় মানুষটি দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কোন হতভাগ্য ঐ অবস্থায় তিন চার দিন পর্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। মাথার ওপর তীব্র রৌদ্রের দাহ। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় সারা দেহ অস্থির। প্রবল জলপানের ইচ্ছা। ক্ষত স্থানে কীট-পতঙ্গের পচা মাংস, রক্ত ইত্যাদি ভোজনের উল্লাস। সব কিছু মিলে যে যন্ত্রণা তার তুলনা অন্য কোথাও নেই বলেই আমার বিশ্বাস।

কিছুক্ষণ যিশুর ছবিখানির দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইলেন

ইমানুয়েল। তারপর বললেন, আমাদের প্রভু বিশ্বের মানুষের জন্য এই দুঃখ স্থির ভাবে বরণ করেছিলেন।

কর্পূরমঞ্জরী মনে মনে এই মহাপুরুষকে নমস্কার করল।

এক তরুণ যাজক ঘরে ঢুকলেন। হাতে তাঁর এক পাত্র গরম দুধ। ইমানুয়েল কর্পূরমঞ্জরীর দিকে ফিরে বললেন, আমরা খৃস্টান। আমাদের হাতে দুধটুকু খেতে আপত্তি আছে কি বোন?

অসীম শ্রদ্ধায় কর্পূরমঞ্জরীর মনটা ভরে উঠেছিল। সে দুধটুকু হাতে নিয়ে নিঃশেষে পান করে বলল, ভগবানের সন্তানদের কোন জাতি আছে বলে আমি মনে করি না পাদ্রী সাহেব।

ইমানুয়েল হিন্দু রমণীর মুখে এ ধরনের কথা আশা করেন নি। তিনি মনে মনে অত্যন্ত খুশী হলেন। কর্পূরমঞ্জরীর খাওয়া শেষ হলে ইমানুয়েল বললেন, চল বোন, তোমাকে তোমার আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

গীর্জা থেকে বেরিয়ে নির্জন পথ ধরে কর্পূরমঞ্জরী চলল ইমানুয়েলের সঙ্গে। পথে সেদিন বিশেষ আর কোন কথা হল না। কর্পূরমঞ্জরী আশা করছিল ধর্মযাজক তা:ক দিলীপ সিংহের ঘটনা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করবেন। কিন্তু সে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল ইমানুয়েল সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব রইলেন। এই সংযমী মানুষটির ওপর কর্পূরমঞ্জবীর শ্রদ্ধা তাই আরও গভীর হল।

আস্তানায় পৌঁছে ইমানুয়েল হেসে বললেন, যদি কোনদিন ইচ্ছা হয় তাহলে এস আমাদের গীর্জায়।

যুক্ত করে নমস্কার জানিয়ে কর্পূরমঞ্জরী মাথা নাড়ল। কৃতজ্ঞতায় মন তার ভরে গেছে। ইমানুয়েল আর কোন কথা বললেন না। ধীরে ধীরে পা ফেলে পথের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সাদা পোশাকে আবৃত দীর্ঘ পুরুষটি কর্পূরমঞ্জরীর চোখের সামনে থেকে সরে গেলেন, কিন্তু মনে তাঁর ছবিখানি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল।

মানুষের প্রতি কর্পূরমঞ্জরীর মনে যে ঘৃণা দিনের পর দিন

জমে উঠেছিল, আজ হঠাৎ এই মানুষটির স্পর্শে এসে তা যেন নিঃশেষে মুছে গেল। সেখানে শুধু জেগে রইল মানুষের জন্য অপার স্নেহ আর প্রাণঢালা মমতা।

এক অপরাহ্নে কর্পূরমঞ্জরী স্বাহার মেয়ে ললিতাকে বলল, একটু বাইরে বেড়িয়ে আসি চল মা। অনেকদিন বাড়ী বসে আর ভাল লাগছে না।

কোথা যাবে মাসি?—ললিতা প্রশ্ন করল।

কর্পূরমঞ্জরীর মনে হঠাৎ একটা উত্তর এল। বলল, ভগবানের রাজ্যে মা।

ললিতা কিছু বুঝল না, কিন্তু আর কোন প্রশ্নও সে করল না। কর্পূরমঞ্জরীর প্রতিটি কথা বিশ্বাস করতেই সে শিখেছিল। মা-হারা সে, মায়ের সবটুকু মমতা পেয়েছিল কর্পূরমঞ্জরীর হৃদয় থেকেই!

গীর্জার কাছে কর্পূরমঞ্জরী ললিতাকে নিয়ে যখন এসে পৌঁছল তখন বেলা আর বেশি নেই। রোদের সোনালী আলোটুকু বেলা শেষের দিকে কেমন এক স্নিগ্ধতায় ভরে উঠেছিল। কর্পূরমঞ্জরী আর ললিতা গীর্জার ভেতরে ঢুকল।

প্রার্থনা হচ্ছিল একটি কক্ষে। পবিত্র প্রার্থনার সুর শোনা যাচ্ছিল। অনুতপ্তের প্রাণের কান্না যেন ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করা হচ্ছে। কর্পূরমঞ্জরী আর ললিতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে থেকে কতক্ষণ দেখল সে দৃশ্য। নতজানু হয়ে স্ত্রীপুরুষ সকলেই বসে আছে। তাদের ভেতরে এ দেশীয় কয়েকটি পুরুষকেও দেখা যাচ্ছিল।

কক্ষটির একপ্রান্তে একটি উচ্চ বেদীর ওপর কয়েকটি প্রস্তরের মূর্তি। প্রার্থনার শেষে যাজক ইমানুয়েল সেই বেদীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটি গ্রন্থ তাঁর হাতে। তিনি বলতে লাগলেন, 'First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.'

এ দেশীয় প্রার্থনাকারীদের উদ্দেশ্যে কথাটিকে ব্যাখ্যা করে

বললেন, প্রভু আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছেন, আগে মানবপ্রীতি, তারপরে দেবপূজা।

মানুষকে আগে ভালবাসতে হবে, তবে মিলবে দেবতার আশীর্বাদ।

প্রভু আরও বলছেন, ভালমন্দ নির্বাচণ করে ভালবাসতে নেই। প্রেম নির্বিচারে সবার ওপর বর্ষিত হবে।

'I say unto you, love your enemies, bless them that curse you , do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you ; that ye may be the children of your Father which is in Heaven ; for He maketh his Sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.'

শত্রুকেও ভালবাসতে হবে। তোমার ওপর যদি কেউ অভিশাপ বর্ষণ করে, তাকে জানাবে তোমার আন্তরিক আশীর্বাদ। যে তোমাকে ঘৃণা করে, তার উপকার করবে। যদি কোন মানুষ তোমার ক্ষতি করে কিংবা তোমার ওপর অত্যাচার করে তাহলেও তার কল্যাণের জন্য তুমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাবে। এমনি ভালবাসতে শিখলে তবেই তুমি হতে পারবে বিশ্বপিতার প্রকৃত সন্তান। ঈশ্বর সকলের ওপরই তাঁর করুণার দৃষ্টিপাত করেন। তাঁর সূর্য পাপী ও পুণ্যবান উভয়েরই ওপর সমভাবে কিরণ প্রদান করে। তাঁর বৃষ্টিধারা ভাল ও মন্দ সকলের কর্ষিত ভূমির ওপরই সমভাবে এসে পড়ে।

ঈশ্বরের ভেতর যে সাম্যভাব রয়েচে, ঈশ্বরের সন্তান হয়ে তোমরাও সেই মত আচরণ কর।

ইমানুয়েল থামলেন। সকলে এবার উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে প্রার্থনা সভা থেকে একে একে বেরিয়ে আসতে লাগল বাইরে।

কর্পূরমঞ্জরী আর ললিতা বাইরে দাঁড়িয়েছিল, প্রার্থনাকারীরা

তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল, কেউ বিশেষ কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে দেখল না।

কর্পূরমঞ্জরী ভাবল, প্রার্থনার ভাবে পূর্ণ হয়ে আছে এঁদের মন।

সবার শেষে বেরিয়ে এলেন যাজক ইমানুয়েল। তাঁর দৃষ্টি কিন্তু এসে পড়ল ওদের দুজনের ওপর। কাছাকাছি এসে চিনতে পারলেন কর্পূরমঞ্জরীকে। হেসে বললেন, প্রভুর অনুগ্রহে তোমাদের দেখে আজ খুব তৃপ্তি পেলাম।

কর্পূরমঞ্জরী আর ললিতা মাথা নত করে নমস্কার জানাল। ইমানুয়েল ইঙ্গিতে তাদের সঙ্গে আসতে বলে চলতে লাগলেন। প্রার্থনাগৃহের শেষ প্রান্তে একটি চমৎকার বাগান। হরেক রকমের ফুল ফুটে রয়েছে সবুজ তৃণের গালিচার ওপর। এদিকে ওদিকে দু'একটি ছোট বড় ফলের গাছ। বাগানের পাশে বসবার কয়েকটি কুশন পড়ে ছিল। ইমানুয়েল তাদের বসতে বলে নিজেও একটিতে বসে পড়লেন।

লোকালয় থেকে স্থানটি দূরে, তাই কোলাহল নেই। বড় নির্জন আর পবিত্র এই পরিবেশটি।

ইমানুয়েল কথা বললেন। কর্পূরঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে সস্মিত প্রশ্ন করেন, তোমার সঙ্গে আজ নতুন আর একজনকে দেখছি!

কর্পূরমঞ্জরী বলল, মা-হারা এই মেয়েটিকে আমার কন্যা বলেই জানবেন।

ইমানুয়েল হেসে ললিতাকে বললেন, নামটি কি মা তোমার?

মেয়েটি বলল, ললিতা।

খুব খুশী হলেন ইমানুয়েল। কর্পূরমঞ্জরীকে বললেন, মেয়েটি তোমার মাতা মেরীর মতই সুন্দর আর পবিত্র।

মুখখানা ললিতার নত হল। স্বভাবতঃই ললিতা লাজুক আর নম্র।

কর্পূরমঞ্জরী বলল, সমাজ্ ছেড়ে চলে এসেছি আমরা। পাপ

করছি, কি পুণ্য করছি কিছুই বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে নিজেদের কথা ভেবে বড় শ্রান্ত হয়ে পড়ি পাদ্রী সাহেব।

ইমানুয়েল সহসা কোন উত্তর করলেন না। কি যেন ভেবে নিলেন মনে মনে। তারপর একসময় কর্পূরমঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে বোন আমার জীবনের ভেতর দিয়েই। একটু থেমে আবার বললেন, যেদিন রাতে তোমাকে আমি দুর্বৃত্তদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করলাম, সেদিন তুমি আমার অসিচালনা লক্ষ্য করেছিলে কি ?

কর্পূরমঞ্জরী বলল, আমি কেন, সেদিন কেউ কল্পনাই করতে পারেনি যে ধর্মযাজক এমন আশ্চর্য অস্ত্র-কৌশল দেখাবেন।

হাসলেন ইমানুয়েল। বললেন, তুমি তোমার সমাজ ছেড়ে এসেছ, আর আমিও একদিন আমার সমাজ ছেড়েই এসেছিলাম। সেদিন আমার সমাজ ছিল ঘৃণ্য। মগদের সঙ্গে মিলে আমরা পর্তুগীজ দস্যুর দল বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে দস্যুবৃত্তি করতাম। কত অসহায় মানুষকে যে আমরা সংসার থেকে ছিনিয়ে এনেছি, কত উৎসবের বাতি যে আমাদের অতর্কিত অস্ত্রাঘাতে নিভে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। মানুষগুলোকে পশুর মত এনে ফেলতাম নৌকোর ভেতর। বেতের ছিলা হাতের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে সবাইকে একসঙ্গে বেঁধে ফেলে রাখতাম। ওরা কাতর চীৎকার করত আর আমরা উল্লাসে সেই চীৎকারের সঙ্গে সুর মেলাতাম। তারপর হতভাগ্যদের নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন দেশে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে আসতাম।

থামলেন ইমানুয়েল। কর্পূরমঞ্জরী আর ললিতার চোখে ততক্ষণে তীব্র বিস্ময় ফুটে উঠেছে। ইমানুয়েল বলতে লাগলেন, সেই পাপের ভার আমার একদিন পূর্ণ হল। আমাদের সঙ্গী একদল মগদস্যু এক রাতে একটি পরম লাবণ্যবতী কুমারীকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এল। আমি তখন দস্যুদলপতি। মেয়েটি আমার পা জড়িয়ে ধরল। কিন্তু মুক্তি পেল না সে। নারী তখন আমাদের

ভোগের সামগ্রী। সেদিন তার চরম সর্বনাশ করলাম। রাতে নৌকোয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মাঝিদের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে শুনলাম মেয়েটি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। এই সামান্য ঘটনা তখন আমাকে বিচলিত করতে পারল না। কিন্তু বিচলিত হলাম তখনই যখন সেই মেয়েটি আবার আমার কাছে ফিরে এল।

মাস দুই কেটে গিয়েছিল। একদিন দেখলাম মেয়েটি আমারই কতকগুলি সঙ্গীর সঙ্গে নৌকোয় উঠে এল। সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করে জানলাম, সে নিজে এসেই আমার খোঁজ করছিল।

বললাম, কি চাও তুমি ?

অদ্ভুত এক হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ। বলল, তোমার কাছ থেকে পালিয়েছিলাম সাহেব, কিন্তু পালাবার পথ তুমি বন্ধ করে দিয়েছ।

সকৌতুকে বললাম, সে কি রকম ?

তেমনি উজ্জ্বল ওর মুখ। বলল, তোমার সন্তানের জননী হতে চলেছি আমি। আশ্রয় দেবে না আমাকে ?

নৌকোয় তুলে তাকে নিয়ে এলাম হিজ্‌লী বন্দরের কাছে আমাদের আস্তানায়।

তাকে গ্রহণ করলাম। সসম্মানে আশ্রয় দিলাম। কিন্তু তার সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারলাম না। কি আশ্চর্য মাতৃত্বের গৌরবে সে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রাণভয়ে যে একদিন রাত্রির নদীকেও তুচ্ছ করে পালিয়েছিল, আজ সে এমন এক শক্তির অধিকারিণী হয়েছে, যার বলে তার সব ভয় দূর হয়ে গেছে!

দস্যুর শক্তি তার কাছে ধূলায় মিশে গেল। তীব্র এক জ্বালা আর অনুশোচনার বিষে জর্জরিত হতে লাগল আমার আত্মা। চুপি চুপি একদিন সব ছেড়ে পালিয়ে এলাম। কতদিন ঘুরলাম পথে পথে।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন এক পাদ্রীর দেখা পেয়ে গেলাম। তিনি আমাকে শোনালেন যিশুর একটি বাণী ঃ

'Come unto me all ye that labour and are heavy leaden, and I will give you rest.'

পরিশ্রান্ত মানব, পাপভারে জর্জরিত মানব, আমার কাছে এসে দাঁড়াও, আমি তোমাদের তাপিত মনে শান্তি এনে দেব।

কি মধুর এই আহ্বান! এতদিনে পথের সন্ধান পেলাম। তারপর আগ্রায় এসে নতুন করে শুরু করলাম জীবন।

থামলেন ইমানুয়েল। আশ্চর্য মানুষটির দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল কর্পূরমঞ্জরী আর ললিতা।

কি এক অনিবার্য আকর্ষণ আছে এই মানুষটির মধ্যে। শ্রান্ত হলে এখানে এসে শান্তি মিলবে, এমন আশ্বাসের কথা আর ত কেউ তাকে এমন করে শোনায়নি।

কর্পূরমঞ্জরী ললিতাকে নিয়ে রোজ আসতে লাগল গীর্জায়। অবারিতদ্বার তাদের। গীর্জার চারদিকের পবিত্র পরিবেশে এসে তারা গভীর প্রেরণা অনুভব করত। মনের ভেতর সঞ্চিত দুঃখের চিন্তাগুলো ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসত। কর্পূরমঞ্জরীর মনে হত, বুঝি কেউ তার তপ্ত মনের ওপর হাত বুলিয়ে দিয়ে বলছে, কিসের ক্ষোভ, কিসের অন্ধকার, চলে এস আমার কাছে। এখানে মায়ের স্নেহ নিয়ে আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছি।

ভাবতে গিয়ে চোখে জল গড়িয়ে পড়ত কর্পূরমঞ্জরীর।

ইমানুয়েল রোজ প্রার্থনার শেষে ভক্তদের সামনে প্রভুর কথা বলতেন। কি অপূর্ব কথা। কর্পূরমঞ্জরী স্তব্ধ হয়ে শুনত। এক অনাস্বাদিত ভাব-জীবনের অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলত।

'Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness : for they shall be filled'.

অনন্ত ক্ষুধা আর তৃষ্ণা মানুষের! কিন্তু তার পরিতৃপ্তি কই? শুধু ধর্মজীবনেই ক্ষুধা আর তৃষ্ণার নিবৃত্তি আছে।

'I am the bread of life: he that cometh to me shall not hunger, and he that believeth on me shall never thirst'.

আমিই জীবনের খাদ্য। যে আমার কাছে আসবে তার ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে। যে আমাকে বিশ্বাস করবে তার সকল তৃষ্ণার নিবৃত্তি হবে।

একদিন সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। কর্পূরমঞ্জরী ললিতার হাত ধরে গীর্জার বাইরে আসছিল। এমন সময় কয়েকটি কথা তার কানে ভেসে এল। ইমানুয়েল ভক্তদের কাছে প্রভুর কথা বলছিলেন,

'I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life'.

আমিই জগতের জ্যোতিঃস্বরূপ! যে মানুষ আমাকে আশ্রয় করবে তাকে অন্ধকারে ঘুরে ফিরতে হবে না। সে জীবনের আলোর সন্ধান পাবে।

সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারের বুকে কর্পূরমঞ্জরী আশ্চর্য সুন্দর এক চন্দ্রোদয় দেখল। ললিতাকে বলল, দেখ মা, দিগন্তকে উদ্ভাসিত করে কেমন অপরূপ এক আলোর বিকাশ হচ্ছে।

তারপরই ইমানুয়েলের কাছে কর্পূরমঞ্জরী আর ললিতা খৃস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করল।

ধর্মজীবনের মাঝে তাদের কেটে গেল কত দিন। সম্রাটের পরিবর্তন হল। জাহাঙ্গীরের পর সাজাহান বসলেন সিংহাসনে।

যমুনার কূলে প্রেমের এক স্বপ্নমন্দিরের সম্ভাবনা দেখা দিল। এই পরিবর্তনের মাঝে এক দিন দেহরক্ষা করলেন যাজক ইমানুয়েল।

জাহাঙ্গীর খৃস্টধর্মের পৃষ্টপোষক ছিলেন কিন্তু সাহাজান এ বিষয়ে

পিতার পথ অনুসরণ করলেন না। খৃস্টানদের ওপর তিনি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করতে লাগলেন।

সম্রাটের দারুণ প্রতিকূলতার মাঝে পড়ে কর্পূরমঞ্জরী সিদ্ধান্ত করল ললিতাকে নিয়ে আগ্রা ত্যাগ করে যাবার।

একদিন অপরিচিত নগরীর বুকে কর্পূরমঞ্জরী সদলে এসেছিল নতুন জীবনের সন্ধানে। একে একে কে কোথায় সরে গেল তার কাছ থেকে।

দুদিনের এই জীবনে উচ্ছল বিলাসকেই তারা বরণ করে নিল।

আজ সঙ্গীহীন সেই নগরীকে ছেড়ে চলল কর্পূরমঞ্জরী। যেখান থেকে একদিন তার যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেইখানেই আবার সে শেষ করবে তার যাত্রা। সে ফিরে যাবে ফেলে আসা সেই বাংলা দেশে।

সাত

সে যুগে হুগলী নদী আর বঙ্গোপসাগরের তীরভূমি মগ আর পর্তুগীজ জলদস্যুদের নারকীয় লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। বাদশাজাদা সাজাহান একসময় বঙ্গদেশের ভেতর দিয়ে উড়িষ্যা যাত্রার কালে পর্তুগীজদের অত্যাচারের কাহিনী শুনে গিয়েছিলেন।

সম্রাট হয়ে তিনি হুগলী নদীর কূলে কতকগুলি নাওয়ার মহল প্রতিষ্ঠার হুকুম দেন। সেই মহলে সরবোলা নামে একদল কর্মচারী নিযুক্ত থাকত। তাদের প্রধান কাজ ছিল যাত্রী নৌকোকে পর্তুগীজ দস্যুদের নাগালের বাহিরে নিরাপদ পথের সন্ধান দেওয়া। কিন্তু কালক্রমে তারাই রক্ষক হয়ে ভক্ষক হয়ে উঠল। যাত্রীদের মিথ্যা সংকেত দিয়ে তারা নদীর কূলে নিয়ে আসত। তারপর তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে অপহরণ করত যথাসর্বস্ব।

সেই হুগলী নদীর কূল ঘেঁষে একদিন চলল কর্পূরমঞ্জরীদের নৌকো। কতদিন পরে বাংলাদেশে ফিরে এল তারা। তাল নারিকেলের সবুজ ঝালর তাদের শাখাবাহু মেলে ডাক দিল ঘরে ফিরে

আসা তাদের দুটি কন্যাকে। ললিতার মনে বাংলা দেশের স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে যেন নতুন চোখ নিয়ে বাংলা দেশকে দেখতে লাগল। কত পূর্ণতা এর জলে স্থলে আকাশে। পরিপূর্ণ যৌবনের চোখ মেলে সে দেখতে লাগল অপরূপ তার মাতৃ-ভূমিকে।

বাংলাদেশে কোথায় যাবে তারা। নির্দিষ্ট কোন আস্তানা তাদের ছিল না। মনে পড়ল খাঁ সাহেবের কথা। সেখানে গেলে নিশ্চয়ই তারা আশ্রয় পাবে। কিন্তু না, এতদিনে বৃদ্ধ খাঁ সাহেব হয়ত আর জীবিত নেই। কেউ এসে হয়ত খাঁ সাহেবের জায়গীর শাসন করছে। কর্পূরমঞ্জরীর মনে পড়ল যাজক ইমানুয়েলের কথা। হিজলী বন্দরের কাছে ফিরিঙ্গি পাড়ায় কোথায় যেন ছিল তাঁর বাস। একবার সেখানে গেলে কেমন হয়। মনস্থির করে ফেলল কর্পূরমঞ্জরী। সারাজীবন যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছে সে। তাই দিয়ে ললিতাকে জীবনে নিশ্চয়ই সে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারবে। দিন শেষ হয়ে গেল। সন্ধ্যার রক্তরাগ মিলিয়ে গিয়ে চারদিক ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। প্রশস্ত নদীর কূল ঘেঁষে ছপছপ দাঁড় টেনে চলতে লাগল কর্পূরমঞ্জরীদের নৌকা।

এক সময় দাঁড়িদের হাত থেমে গেল। মাঝি হাল ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মাঝে কি যেন দেখতে লাগল। দূরে নদীর কূলে একটা আলো জ্বলছে আর নিভছে। মাঝি বলল, সাবধান, আর এগিয়ে যাওয়া চলবে না। সরবোলাদের আলো দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই সামনে পর্তুগীজ দস্যুদের নৌকো রয়েছে।

স্থির হয়ে গেল নৌকো। নোঙর পড়ল সেইখানেই। কিন্তু আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই আলো দেখা গেল। এবার মাঝি বলল, টানো দাঁড়। সরবোলাদের ঐ আলোর কাছে গিয়ে পৌঁছতে হবে, নাহলে এখানেও রক্ষে নেই।

নৌকো গিয়ে কূলে ভিড়ল। নাওয়ার মহলের কয়েকটি

কর্মচারী নৌকোয় কাছে এগিয়ে এল। তাদের চোখে মুখে উদ্বেগের ছায়া। হাতে বল্লম আর সড়্কী। তাদের কাছে শোনা গেল, আজ দুপুরেই সুসজ্জিত পর্তুগীজ নৌকো নদীতে দেখা গেছে। তারা নিশ্চয়ই এখানে নদীর কোন বাঁকের মুখে অপেক্ষা করছে।

সরবোলারা বলল, নৌকো নিয়ে মাঝি আর দাঁড়িরা এখানে থাকুক, কিন্তু মেয়েরা চলুক আমাদের সঙ্গে নাওয়ার মহলে। সেখানে রাতে থাকবার সুবন্দোবস্ত আছে। ভোরে আমরাই আবার তাঁদের এখানে পৌঁছে দিয়ে যাব।

কর্পূরমঞ্জরী এ প্রস্তাবে রাজী হল। মোগল সরকারের প্রতিষ্ঠিত নাওয়ারের কর্মচারী এরা। এদের সঙ্গে মহলে যেতে আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। তাছাড়া বহু অলঙ্কার আর সোনার মোহর রয়েছে তার কাছে। এ অবস্থায় 'দস্যু-নদীতে' রাত কাটান সুবিবেচনার কাজ নয়। হুগলীর নাম হয়েছিল তখন দস্যু-নদী। মাঝিরা নদীর কূলে নৌকো নোঙর করে রইল। সরবোলাদের সঙ্গে সঞ্চিত ধনরত্ন নিয়ে চলল কর্পূরমঞ্জরী আর ললিতা।

একটা মশালের আলোয় পথ দেখে দেখে তারা অনেক দূর হেঁটে চলে এল। সামনেই নদী বাঁক নিয়েছে। সেই বাঁকের মুখে কতকগুলো গাছের জটলা। অন্ধকারটা ঘন হয়ে উঠেছে সেখানে। হঠাৎ মশালের আলোটা নিভে গেল। সঙ্গী লোকগুলো অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল কর্পূরমঞ্জরী আর ললিতার ওপর। ছিনিয়ে নিল তারা তাদের সমস্ত সঞ্চয়। প্রাণভয়ে চীৎকার করে উঠল দুটি অসহায় মেয়ে। নারীকণ্ঠের আর্ত চীৎকার নদীর জলে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রবল চীৎকার উঠল পাশের নদীতীর থেকে। কারা যেন হৈ হৈ করতে করতে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। সরবোলারা সে চীৎকার শুনে প্রথমে থমকে দাঁড়াল। তারপর বল্লম আর সড়্কী নিয়ে লড়াইএর ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে গেল।

শেষের দলটি এত কাছে এগিয়ে এসেছে যে পালান একেবারে নিরর্থক। তাই সরবোলারা লড়াইএর জন্য তৈরি হয়ে রইল।

বিদ্যুৎবেগে এসে পড়ল শেষের দলটি। হাতে তাদের জ্বলন্ত মশাল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা খণ্ড প্রলয় বেঁধে গেল। হতাহত হল দু'পক্ষেরই কয়েকজন লোক। শেষে জয় হল শেষের দলটির।

কর্পূরমঞ্জরী ললিতাকে জড়িয়ে ধরে বসেছিল ঝোপের আড়ালে। পর্তুগীজ দলপতি গঞ্জেলো সেখানে হাজির হল। এক দস্যুর হাত থেকে অন্য দস্যুর হাতে এসে পড়ে কর্পূরমঞ্জরী ভয়ে কাঁপতে লাগল।

গঞ্জেলো পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলল, কোন ভয় নেই মা। কোথায় যাবে বল, আমি তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসব।

দস্যুর কথায় এবার কর্পূরমঞ্জরীর অবাক হবার পালা। সে চোখ তুলে দেখল একটি বিদেশী যুবক তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মশালের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল তাকে। কি আশ্চর্য সুন্দর দুটি টানা-টানা চোখ। সে চোখে কর্পূরমঞ্জরী দস্যুতার কোন চিহ্নই দেখতে পেল না।

কর্পূরমঞ্জরী বলল, বাবা, কোন নির্দিষ্ট যাবার জায়গা আমাদের নেই। বহুদূর অঞ্চল থেকে আমরা আসছিলাম। তবে হিজলী বন্দরের কাছাকাছি ফিরিঙ্গিপাড়াতে এক ভদ্রলোকের বাড়ীর খোঁজ নেবার ইচ্ছে ছিল আমাদের।

যুবকটি বলল, সে পাড়াতে ত কোন হিন্দু বাস করে না মা।

হিন্দু নয়, একজন পর্তুগীজের বাড়ীর খোঁজ নেবার ইচ্ছে আছে বাবা।

যুবকটি বলল, হিজলীর দূরত্ব এখান থেকে খুব বেশী নয়। চলুন আপনাদের সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কর্পূরমঞ্জরী আর ললিতা পর্তুগীজদের নৌকোয় গিয়ে উঠল। নৌকো ছেড়ে দিল হিজলী বন্দরের অভিমুখে।

চাঁদ উঠল। নদীর জলে আলোছায়ার বিচিত্র খেলা শুরু হল। কর্পূরমঞ্জরী ভাবতে লাগল তার রহস্যময় জীবনের কথা।

একসময় নৌকো এসে কূলে ভিড়ল। যুবক কর্পূরমঞ্জরীর কাছে এসে বলল, আমি ফিরিঙ্গি পাড়াতেই থাকি। বলুন আপনাকে কার বাড়ী নিয়ে যাব।

কর্পূরমঞ্জরী বলল, জানি না বাবা, সে মানুষটির আজ আর কেউ বেঁচে আছে কিনা। তবে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে এই ফিরিঙ্গি পাড়াতেই তাঁর বাস ছিল। তিনি তাঁর একটি হিন্দু পত্নীকে এখানে ফেলে রেখে চলে যান।

কি নাম তাঁর! হঠাৎ প্রশ্ন করতে গিয়ে যুবকের গলার স্বর কেঁপে গেল।

তাঁর নাম ইমানুয়েল।

কর্পূরমঞ্জরীর কথা শেষ হতে না হতেই শিশুর মত দুটি হাত জড়িয়ে ধরে গঞ্জেলো চীৎকার করে উঠল, ইমানুয়েল, ইমানুয়েল! আমার বাবা ইমানুয়েল। হঠাৎ আনন্দের উত্তেজনায় ডুকরে কেঁদে উঠল গঞ্জেলো।

কর্পূরমঞ্জরী আর ললিতার বিস্ময়ের সীমা নেই। যাজক ইমানুয়েলের অদেখা সেই সন্তান এই গঞ্জেলো!

কতক্ষণ পরে প্রথম উত্তেজনা কেটে গেল। তখন ধীরে ধীরে গঞ্জেলোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কর্পূরমঞ্জরী বলল ইমানুয়েলের মৃত্যুর কথা। আগ্রাতে তাঁর যাজকজীবনের পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনের কথা। মৃত্যুর মাঝে তিনি যে অমর জীবন লাভ করেছেন সে কথা কর্পূরমঞ্জরী শোনালো ইমানুয়েলের শোকতপ্ত সন্তানকে। শেষে বলল, বাবা, প্রথম জীবনে তোমার পিতা দস্যুবৃত্তি করলেও পরবর্তীকালে তিনি পরম সাধকের জীবন যাপন করে গেছেন। তাঁর সন্তান হয়ে তোমার দস্যুবৃত্তি সাজে না।

গঞ্জেলো এতক্ষণে মুখ তুলে তাকালো কর্পূরমঞ্জরীর দিকে।

চোখ দুটো তার দীপ্ত হয়ে উঠল। সে বলল, আমার জননী আমাকে দস্যুবৃত্তি শিক্ষা দেননি মা।

কর্পূরমঞ্জরী বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে গঞ্জেলো বলল, আমাদের সঙ্গে সশস্ত্র লোক লস্কর দেখে আপনারা হয়ত ভেবেছেন আমরা দস্যুবৃত্তি করি। কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রথম জীবনে বাবা যে পাপ করেছিলেন, মায়ের আদেশে আমি সেই পাপের স্খালন করে বেড়াচ্ছি। অত্যাচারিতকে রক্ষা করা, দাহকুণ্ড থেকে সতীদের বলপ্রয়োগে উদ্ধার করাই আমাদের কাজ।

গঞ্জেলোর দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল কর্পূরমঞ্জরী। দু'চোখ বেয়ে তার জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ললিতা এতক্ষণ ওদের দুজনের কথার ফাঁকে লক্ষ্য করছিল গঞ্জেলোকে। শেষের কথাটি শুনে গঞ্জেলোর ওপর শ্রদ্ধায় তার মন ভরে গেল।

গঞ্জেলো এবার তাদের নিয়ে চলল তার আস্তানায়। আজ কর্পূরমঞ্জরী আর ললিতা তার বাড়ীতে সম্মানীয় অতিথি। তার হারানো বাবার খবর তারা বয়ে নিয়ে এসেছে সুদূর আগ্রা থেকে।

বাড়ীতে পৌঁছেই দরজায় ধাক্কা দিয়ে মা মা বলে ডাকতে লাগল গঞ্জেলো।

দরজা খুলে গেল। মোমের বাতি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন প্রৌঢ়া এক মহিলা। সামনে কয়েকজনকে একসঙ্গে দেখে বাতিটি তুলে ধরলেন। সেই বাতির আলোয় পরস্পর পরস্পরকে দেখতে লাগলেন। একি! অনিমেষে প্রৌঢ়া তাকিয়ে রইলেন কতক্ষণ।

সহসা হাত থেকে খসে পড়ে গেল মোমের বাতি। 'কর্পূর' বলে কেতকীমঞ্জরী জড়িয়ে ধরল ছোট বোনকে। শৈশবের হারান দিদির বুকে মাথা রেখে বালিকার মত ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল কর্পূরমঞ্জরী।

* * * *

সারারাত আনন্দবেদনার স্মৃতি রোমন্থনে কেটে গেল। মা-হারা

ললিতার কথা কর্পূরমঞ্জরীর মুখ থেকে শুনল কেতকীমঞ্জরী। আজ ললিতা সবার প্রিয় হয়ে উঠল।

সে তার রক্ত সম্পর্কের কাউকে না পেয়েও কুড়িয়ে পেল সবার ভালবাসা।

রাতশেষে নদীর কূলে দেখা গেল ছুটি তরুণ তরুণীকে। কথা হচ্ছিল তাদের মধ্যে। তরুণটি বলল, আমি জানি না কবে পর্তুগাল থেকে আমাদের পূর্বপুরুষ এসেছিল এ দেশে। আমি জানি ললিতা, এই বাংলাই আমার দেশ। এ আমার জন্মভূমি। আমি আমার জন্মভূমি এই বাংলাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি।

ললিতার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, আমি আমার দেশকে ভালবাসি গঞ্জেলো, আর ভালবাসি সেই মানুষকে যে বিদেশী হয়েও আমার দেশকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে।

শুকতারা জ্বলজ্বল করছে পুবের আকাশে। উজ্জ্বল একটি সম্ভাবনাময় দিনের পূর্বাভাস!